দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-১

কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারের ওপর মাথা নীচু করে বসে আছে রতন। দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা গুঁজে তন্দ্রা আর জাগরণের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে ও। পৌষের শেষ। এবার ঠান্ডাটা খুব একটা জাঁকিয়ে পড়েনি। তবু খোলা আকাশের নীচে মধ্য রাতের উদ্দাম হাওয়ায় সোজা হয়ে বসে থাকা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ছে। সুতির চাদরটা দিয়ে রতন নিজেকে পুরোপুরি মুড়িয়ে নিয়েছে। চেয়ারের ওপর বসেছে পা তুলে। মোটা মোজা পা দু'টোকে রক্ষা করলেও পাতলা লুঙ্গির ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে ওর ঊরুদ্বয় কাঁপিয়ে তুলছে। মনে মনে মহির চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গাল দিতে থাকে রতন। এ ঠান্ডায় কেউ যাত্রা দেখতে আসে? বাজারের একপাশে এক ফালি খোলা জায়গায় কাঠের তক্তা আর বাঁশ দিয়ে ছোট একটা স্টেজ বানিয়ে যাত্রার আসর বসেছে। উপরে লাল আর সাদা কাপড়ের প্যান্ডেল। 'যাত্রা-ফাত্রা' এমনিতেই রতনকে টানে না। তারপর এই পালাটা একদমই নিরস। 'সৈয়দবাড়ির বউ'। ধনী সৈয়দবাড়িতে ঘটনাচক্রে বউ হয়ে আসা গরীব ঘরের মেয়ে হাসিনার দুঃখময় জীবনকাহিনী। খালি কান্না আর কান্না।

মহি বলেছিল, 'দোস্ত, রাইত দেড়টা নাগাদ ঝিম মাইরে থাকিস। তারপর দেখবি এক পরী আইসবে। তুর বুকের মইধ্যে চাক্কু মাইরে তুকে বেহেসতে নিয়ে যাইবে।'

মহির কথা শুনে অন্য যারা এই যাত্রাটা দেখেছে তারা সবাই এক সাথে মাথা দুলিয়েছে। বলেছে আসছে বুধবার আবার দেখতে যাবে। রতন একাই এসেছে আজ। শরীরটাকে গরম করার জন্য সেই সন্ধ্যা থেকে কানাই-এর চোলাই থেকে আনা বাংলার বোতলটায় একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে প্রায় শেষ করে এনেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পরীর দেখা মেলে নি।

নেশার ঘোর লেগেছে চোখে। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখটা টেনে আসছে। ঝিমিয়ে পড়লে নায়িকার কান্না আর তার সাথে হারমোনিয়াম আর সানাই-এর সম্মিলিত আর্তনাদে আবার চমকে উঠছে রতন। ঝিমুনিটা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল। সহসাই রতনের মনে হল কোনো শব্দ নেই আসে পাশে। দর্শক-শ্রোতা-অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাই যেন মূক-নিঃশব্দ হয়ে গেছে। মাথাটা তুলে চোখ রগড়ে রতন তাকিয়ে দেখল সত্যিই যেন স্টেজ-এর ওপর নেমে এসেছে এক ডানাকাটা পরী। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। কাজল-রাঙানো টানা-টানা চোখ। আগুন-লাল ঠোঁটে মুচকি হাসির ছোঁয়া। মিত্তির বাড়ির মন্দিরে রাখা রাধার নিটোল মুখশ্রীটা যেন ধারণ করে আছে এই পরী। মহির পরামর্শে একদম সামনের সারিতে বসেছিল রতন। তার জন্য বাড়তি দশটা টাকা দিতে হয়েছে। কিন্তু পরী দেখার জন্য দশ টাকা এমন কি আর বেশী? পরনে ফিনফিনে পাতলা সাদা শাড়ি। তার ভেতরে গাঢ় লাল এক টুকরো কাপড় দিয়ে বুকটা ঢাকা। সেই কাপড় উথলে উন্মাদের মতো বেরিয়ে আসতে চাইছে পরিপূর্ণ সুপুষ্ট বুক। অনেক নীচু করে শাড়িটা পরা। একটুও বাড়তি মেদ নেই পেটে। নাভিমূল হাতছানি দিয়ে ডাকছে রতনকে।

যেন বলছে, 'নে, আমি তো বইসে আছি তুর জন্যি।'

গান গেয়ে উঠল সেই পরী, 'ও আমার অল্প বয়সের পীরিতি, মনেতে লাগাইল আগুন।'

তার সাথে বুক দুলিয়ে দুলিয়ে প্রতিটি বাঁকে ঢেউ তুলে নাচতে লাগল। দর্শকের চেতনা সম্মোহনে অবশ করে তুলল। শুধু রতন নয় পুরো জনতা মুখ হাঁ করে নিষ্পলক তাকিয়ে দেখতে থাকলো সেই পরীর নিতম্বের আলোড়ন। কান পেতে শুনতে থাকলো কণ্ঠের মাতাল সুর। তারপর হঠাৎ থেমে গেল গান। স্তব্ধ হয়ে গেল পরীর নূপুরের নিক্কণ। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল সেই পরী সবাইকে নির্বাক করে দিয়ে।

রতন চিৎকার করে উঠল, 'কুথায় গেলে? কুথায় গেলে?'

দর্শকসারিতে জেগে উঠল তুমুল হট্টগোল।

তা ছাপিয়ে মাইকে ঘোষণা হল, 'আপনারা এতসময় দেইখলেন লাইস্যময়ী মিস মালার নাচ। শুইনলেন তার গান। মিস মালা আবার আইসবেন কাইলকের শোতে। তারে দিখার জন্যি আপনিদের কিন্তু আবারো আইসতে হবে।'

পর পর সাতদিন মিস মালাকে দেখার জন্য যাত্রা দেখতে গেল রতন। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য বাংলা খেয়ে, চরসে টান দিয়ে রাত জেগে প্রথম সারিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল মিস মালার জন্য। মনে বড় আশা একবার যদি লুটিয়ে পড়ে মিস মালার আঁচলটা। একবার যদি হোঁচট খেয়ে মিস মালা উপুড় হয়ে পড়ে ওর সমুখে। খোলা আকাশের নীচে প্রতি রাতে এই অত্যাচার শরীরটা আর সহ্য করতে পারল না। দুনিয়া কাঁপিয়ে জ্বর এল রতনের। বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারছিল না। তিন সপ্তাহ জ্ঞান-অজ্ঞানের মধ্য দিয়ে টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত নিতাই কবিরাজের টোটকায় রতন আবার উঠে বসতে পারল। এই তিন সপ্তাহ ঘোরের মধ্যে শুধু মিস মালাকে দেখেছে রতন। ওর জ্বরের কপালে মিস মালা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মিস মালার কোলে মাথা রেখে রতন নাক ডুবিয়ে দিচ্ছে ওর নাভিমূলে। মিস মালাকে নিয়ে নদীতে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কাশবনে ছুটে ছুটে গান গাচ্ছে। ওর পুরো চেতনা হয়ে রইল মিস মালাময়।

ভালো হয়ে রতন যখন চলাফেরার শক্তি ফিরে পেল তখন যাত্রার দল ওদের এলাকা ছেড়ে চলে গেছে অনেক দূরে। খুব মনে হতে থাকল মিস মালার কথা রতনের। মিস মালাকে বুকে জড়িয়ে ধরার দুরাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বাড়তে থাকলো ওর মাঝে। বৌ সখির দিকে তাকিয়ে রতনের সেই দুরাশা আরো প্রকট হয়ে উঠতে থাকলো। তিন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সখির শরীরে আর কোনো যৌবন অবশিষ্ট নেই। পঁচিশ বছরও বয়স হয়নি সখির এর মাঝেই শরীর শুকিয়ে ভেঙে চুরে প্রৌঢ়ত্ব পেয়েছে। রাতে তলপেট শিউরে উঠলে এখনো সখিকে মন্থন করে বটে কিন্তু রতন টের পায় সখির মধ্যে কোনো ধরণের আবেশ জেগে ওঠে না। শীতল পাথরের মতো সখি ওকে ধারণ করে তারপর রতনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ঘুমে তলিয়ে যায়। ভীষণ রাগ হয় রতনের। নিজেকে খুব বঞ্চিত মনে হয়। ওর বন্ধুদের সবার বউগুলোই এখনো কতো তরতাজা আছে! মিস মালাকে দেখার পর থেকে সেই বঞ্চনা রতনের মাঝে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

কোনো কাজ নেই রতনের। বাপ মারা গেছে দু' শীত আগে। তারপর জমি-জিরেতের মালিকতো বলতে গেলে রতন একাই। বড় এক সৎ ভাই আছে। ঢাকা শহরে চাকরি করে। কাগজ-কলমে সেই ভাই অর্ধেক জমির মালিক হলেও কালে-ভদ্রে গ্রামে আসে। ধান বিক্রির পর কিছু টাকা রতন দিয়ে আসে ভাইকে। মাঝে মাঝে তার সাথে ক্ষেতের কিছু সব্জি, কিছু ফল, গুড়, চিঁড়া-মুড়ি। তাতেই সন্তুষ্ট থাকে ভাই। অনেকটাই জমি ওদের। দাদার আমল থেকে বর্গা দেওয়া। ঘরের-বাইরের কাজ করার জন্য পুরোনো বিশ্বস্ত লোক বহুদিন ধরে আছে। রতনের তাই কোনো কাজই করতে হয় না। প্রথম বউ মারা যাবার পর বাপ আর একটা বিয়ে করেছিল। প্রথম ঘরের ছেলেটা সেই বিয়েটা মন খুলে মেনে নেয়নি। বিয়েতে বাধা দেয়নি বটে কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করার পরই ঢাকা শহরে চলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বউ-য়ের

ঘরে তিন মেয়ের পর ছেলে রতন। বাপের প্রৌঢ় বয়সের পুত্র সন্তান। খুব আদর করতো বাপ ওকে। কেউ শাসন করতে পারতো না রতনকে।

রতন দুষ্টামি করলে বাপ বলত, 'ছোট ছেইলে। বুইঝে কি আর কইরছে?'

রতন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করলে বাপ বলেছিল, 'পইড়ে কি হবে? জমি-জিরেততো আমি রেখেই যাইচ্ছি। যে লিখাপড়া জানে উতো আমার খোজও নেয়নানে।'

ছোটবেলা থেকেই ভীষণ দুষ্ট রতন। যা চাই তাই দিতে হবে ওকে। নাহলেই কেঁদে-কেটে সারা বাড়ি মাথায়। মাকে দুমদুম করে ঘুষি মারত। ছুঁড়ে মারত কাঁসার গ্লাশ-থালা-বাসন। না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ওকে থামানো যেত না। কোনো কথা বলেই ওকে ভুলানো যেত না। ছ' সাত বছর বয়স থেকে সারা গ্রাম টো টো করে ঘুরে বেড়াতো। কার গাছে টসটসে পেয়ারা ধরেছে, কার ক্ষেতে লাল হয়ে টমেটো ফলেছে সব রতনের নখদর্পণে। প্রতিদিন কেউ না কেউ বাপের কাছে আসতো রতনের নামে নালিশ নিয়ে।

বাপ বলত, 'এইটুকু বাচ্চা। কতটুকু আইর খাবে? তুমরা শুধুমুধু ছেইলেটার পিছে লাগ।'

আর একটু বড় হলে তরতর করে খেজুর গাছে উঠে ফাঁপা পেঁপেগাছের ডাল দিয়ে আরাম করে টেনে টেনে খেজুরের রস খেত। দশ বছর বয়সে সিগারেট ধরেছিল রতন। তের বছরে চরস। আর তার কিছুদিন পরে কানাই-এর দোকানে প্রায় সন্ধ্যায়ই ঢুঁ মারতো। শহরের পতিতাপল্লীতে আনাগোনা করে রতন যখন সিফিলিস বাঁধিয়ে এল তখন বাপের মনে হল এবার একটু লাগাম টানা দরকার। হাসপাতালে রেখে ঠিকমত চিকিৎসা হল রতনের। তারপর সখির সাথে বিয়ে দিয়ে দিল বাপ। তরতাজা উনিশ বছরের মেয়ে সখি। বিছানায় দাপিয়ে চড়িয়ে বেড়াত রতনকে। সখির টানে ঘরমুখী হয়েছিল রতন। বেশ কিছুদিন ভালো হয়ে ছিল। বাপের সাথে থেকে থেকে জমি-জিরেতের কিছু কাজও শিখেছিল।

সন্তানের জননী হতে হতে সখির মোহ কেটে গেল কিছুদিনেই। ততদিনে বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। বাপটাও কাশিতে ভুগতে ভুগতে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল, তার কিছুদিন পর চলে গেল মাও। আর রতন আবার ফিরে গেল পুরোনো স্বভাবে। আবার সেই নেশা। শহরে গিয়ে মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে টানাটানি। তবে এখন শিক্ষা পেয়েছে রতন। আবরণের প্রতিরক্ষা মেনে তারপর উপগামী হয়। ইদানীং শুরু হয়েছে তাসের জুয়া আর হাউজির আসর। বেশ মজা লাগে রতনের। তিন তাসের খেলায় ভাগ্যদেবী কখন যে কোনদিকে নিয়ে যায়! হাতে টেক্কার জোড়া নিয়ে বুঝতে হয় কি আছে প্রতিপক্ষের হাতে। আছে কি তিন সাহেব? এই অপেক্ষা, এই না-জানার উত্তেজনা রতনকে মাতিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে রতন জিতেও যায়। তবে হারই বেশী দিন। বাপের জমানো টাকা হারতে হারতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। টান পড়েছে ধান-বিক্রির টাকায়। এর মাঝে দূরের ছোট এক চিলতে জমি বিক্রিও করে দিয়েছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই শহরে যাবার জন্য রতনের ভেতরটা ছটফট করতে থাকে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারীতে পতিতাপল্লীর পাউডার আর শস্তা সুগন্ধীর চড়া সুবাসে বুঁদ হয়ে থাকে রতন। কাঞ্চির কোমরে হাত বুলাতে বুলাতে পাঁজরে নরম বুকের স্পর্শ নিতে নিতে রতন অর্থ হারানোর পাঁক গভীর করে গায়ে মাখতে থাকে।

শরীরটা বেঁকে বসার পর অনেক দিন শহরে যাওয়া হয়নি রতনের। এখনো জোর পাচ্ছে না দু' মাইল হেঁটে নৌকায় গড়াই নদী পার হয়ে তারপর আধ ঘন্টা বাসে চেপে শহরে যাবার। সকালে আম-দুধ দিয়ে নাস্তা সেরে চরসে দু'টান দিয়ে ক্ষেতের পাশে বসেছিল রতন। ফাল্গুনের শুরু। বোরো ধানের নতুন চারা সবে মাথা তুলেছে মাত্র। হাতে কোনো টাকা নেই। কবে এই ধান কাটা হবে, বিক্রি হবে তারপর নতুন টাকার মুখ দেখবে। ততদিন কি করবে রতন? পুকুরের মাছ, ক্ষেতের সব্জি দিয়ে সংসারের খাওয়ার জোগান হয়ে যাবে কিন্তু শহরে গিয়ে রতনের ফূর্তির টাকা আসবে কোত্থেকে? ভাবনায় রতনের মনটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কি করা যায় তা ভাবতে ভাবতে দেখে দূরে মহি আসছে। মহিকে আসতে দেখে

রতনের গলার ভেতর শুকিয়ে ওঠে। মহিকে একটা কাজ করতে দিয়েছিল। করতে পেরেছে কি? কাছাকাছি আসতে রতন দেখল মহির মুখে প্রশস্ত হাসি। কাজটা কি তাহলে সত্যিই করতে পেরেছে মহি?

মহি হাসতে হাসতে বলল, 'খোজ পেইয়েছি বন্ধু। শুধু খোজ পাইনিকো আরো অনেক খবর যুগাড় কইরে এইনেছি।'

মিস মালার খোঁজ বের করতে রতন পাঠিয়েছিল মহিকে।

মহি বলল, 'উরা আছে মাছপাড়া গেরামের কাছে। বাসে কইরে যাইতে অদ্ধেক দিন লাইগে যাবে। আমি দিখা কইরে এইসেছি পালার মালিক শফিক মিয়ার সাতে। উরে তুর কথা বুলার সাতে সাতে চিনতে পাইরল। বুলল রতন মিয়া তো মালার পীরিতে হাবুডুবু খাইচ্ছে। আমি বুললাম যুদি বুঝই তবে রতনের সাতে মালার মিল করায়ে দেও না কেন? উ কি বুলল জানিস? বুলল মালা আমার মাথার মণি। উর টানেই গেরামের পর গেরামের লোক বানের মতো আমার পালা দিখতে আইসে। উরে কি আমি ছাইড়ে দিতে পারি। তয় রতন মিয়া যুদি মালার সাতে কিছু সময় কাটাইতি চায় তার বেবস্থা আমি কইরে দিতে পারি। তবে কি জানো তার জন্যি অনেক ট্যাকা লাইগবে। রতন মিয়ারে বল যদি মালার সাতে দেখা কইরতে চায় তবে যেন সাতে কইরে দশ হাজার ট্যাকা নিয়ে আসে।'

দশ হাজার টাকা? রতনের চোখ বড় বড় হয়ে যায়। মালার সাথে দেখা করার জন্য দশ হাজার টাকা লাগবে?

রতনের হতভম্ব চেহারা দেখে মহি আশ্বাস দেয়, 'ঘাবড়াইস না বন্ধু, আমি খুলসা কইরে জিজ্ঞিসা কইরেছি এই দশ হাজার ট্যাকা দিয়ে কি কি করা যাইবে। কি বুলছে জানিস? তিন দিনের জন্যি মালাকে তুই সাতে কইরে নিয়ে আইসতে পারবি। এই তিনদিন তুই মালার সাতে কি কইরবি তা তুর আর মালার বেপার। তবে দশ হাজার ট্যাকা যদি নিয়ে যাইস তবে শফিক মিয়া তুর হাতে মালারে তুইলে দিবে। তিন দিন পর তুই মালারে ফিরায়ে দিবি।'

তিন দিন মালাকে নিজের কাছে রাখতে পারবে? রতনের বিশ্বাসই হতে চায় না। দশ হাজার টাকা ও কোথায় পাবে এখন? দশ হাজার টাকার জন্য মালা রতনের হাত থেকে হারিয়ে যাবে?

ভাবনায় রতন যখন মশগুল হয়ে থাকে তখন দূর থেকে ওকে ডেকে ওঠে আতর আলী, 'রতন মিয়া না? শরীরটা ভালো হইয়েছে দেখি শেষমেষ। তবে ইবার শহরে আইস। তুমি নাই খেলা জইমে উঠছে নানে। নতুন আরো খেলা এইসেছে। আরো বড় দাইনের।'

আতর আলী ওদের জুয়া খেলার নিয়মিত সদস্য। আমিন মাতব্বরের বড় ছেলে। ধানী জমি, ফার্মেসী, মেয়েদের কলেজ, অটোমেটিক রাইস মিল, আলুর গোডাউন কি নেই মাতব্বরের? আতর আলীতো সারা জীবন জুয়া খেলেও সেই টাকা শেষ করতে পারবে না। আর রতন খালি হাত কামড়ানো ছাড়া আর তো কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না। রাগে, দুঃখে, হতাশায় রতনের চোখটা ছলকে ওঠে। মহিকে অবাক করে দিয়ে লাথি মেরে ক্ষেতের আল ভেঙে হনহন করে বাড়ির দিকে ফিরে যায় রতন। এই গাড্ডা থেকে বের হবার একটা উপায় ওকে খুঁজে বের করতেই হবে।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-২

গত এক বছর ধরে এই দিনটার জন্য আলো নিজেকে প্রস্তুত করে রাখছিল। তবু যত প্রস্তুতিই থাকুক না কেন, যতই অনুভবকে সান্ত্বনা দিক না কেন, দিনটা যখন সত্যিই এল তখন আলো আর কিছুতেই নিজেকে শান্ত করে ধরে রাখতে পারলো না। সাদা কাপড়ে মুড়ে রাশেদের লাশটা যখন কফিনে ভরা হল তখনো আলো কান্না চেপে পাথর হয়ে ছিল। যখন মৌলবী সাহেব রাশেদের সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলে অশ্রুভেজা কণ্ঠে দোয়া-দরুদ পড়লেন তখনো অকম্পিত কণ্ঠে আলো গলা মিলিয়েছিল। কিন্তু কফিনটা কবরে নামিয়ে যখন শাবল দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটি ফেলা হচ্ছিল আর সেই মাটি ফেলার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল সারা গোরস্থানময় তখন আলোর সব বাঁধ ভেঙে গেল।

ওর বোধে প্রচন্ড আঘাত করে কে যেন বলল, 'দেখ, রাশেদ সত্যিই চলে যাচ্ছে'।

আলোর উপলব্ধি হল অনন্তকালের জন্য মাটির নীচে ওরা লুকিয়ে ফেলছে রাশেদকে। আর কোনোদিন রাশেদের ঘামের গন্ধ জ্বালাবে না আলোর জৈবিক বোধ।

আর্ত চিৎকার করতে করতে অশ্রুতে দু' গাল ভাসিয়ে দিতে দিতে আলো দৌড়ে যেতে চাইল রাশেদের কবরের দিকে, 'ওগো তোমরা ওকে যেতে দিও না গো। ওকে তোমরা মাটিতে ঢেকে ফেল না। আমার তো আর কিছুই রইল না গো। হে আল্লাহ আমি এখন কি নিয়ে বাঁচব?'

ছুটন্ত আলোকে জোর করে ধরে রাখল ভাবী ছবি, ওর ষোল বছরের ছেলে পরাগ, উনিশ বছরের মেয়ে পারুল। রৌদ্রময় প্রখর দুপুরে আজিমপুর গোরস্থানের নৈঃশব্দ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল আলোর হৃদয়-নিংড়ানো হাহাকারে।

ছবির বুকে মুখ গুঁজে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল আলো। ছবি ওকে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে নিয়ে তুলল।

পরাগ আর পারুলকে বলল, 'তোমরাও চলো আমার সাথে। তোমাদেরকে বাড়ি নামিয়ে দিয়ে আমি ফিরব।'

পরাগ গেল ওদের সাথে। পারুল দেখল দূর থেকে ওর স্বামী ওকে ডাকছে।

পারুল বলল, 'আপনারা যান। আমাকে একটু বাড়ি যেতে হবে।'

ওদেরকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ছবি আর বসল না। হাবিবভাই ঢাকায় নেই। ছেলেমেয়েদেরকে বাড়িতে কাজের লোকের কাছে রেখে এসেছে তাই ছবির তাড়া ছিল। ততক্ষণে আলোও নিজেকে সামলে নিয়েছিল অনেকটাই।

বলল, 'তুমি যাও ভাবী। আমি ঠিক আছি। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না।'

পরাগের সামনে পরীক্ষা। মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসল ও তারপর জোর করে বইয়ে মুখ ডোবাল। একা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ দু'টো জ্বালা করে উঠলো আলোর। যে লোকটা ওর এই সর্বনাশের জন্য দায়ী তার কথা মনে পড়ে রাগে আলোর সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল। কোথায় আছে সে এখন? এখনো কি শাস্তি ভোগ করছে সে? পাঁচ বছর আগে যেদিন একটা চিঠি এসে ওদের সুষম জীবনটাকে তছনছ করে ফেলল সেই দিনটার কথা আবার মনে ফিরে এল আলোর। যেন গতকাল। সবকিছু এখনো বায়সচক্ষুর মতো টলটলে, স্পষ্ট।

ছোট চাকরি করত রাশেদ। সোনালী ব্যাংক লালবাগ ব্রাঞ্চের ক্যাশিয়ার। অসংখ্য প্রলোভনের মাঝে রাশেদ কিভাবে যেন নিজেকে ঋজু রেখেছিল। সৎ থাকার জন্য যে মনের জোরটুকু থাকা দরকার তা রাশেদের মাঝে ছিল। আলো ভাবে ওদের জীবনে স্বচ্ছলতা ছিল না। রাশেদের স্বল্প বেতন আর টিউশনির টাকায় বড় টানাটানির মধ্যে সংসার চলত। কিন্তু শান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল। ছেলেমেয়ে দু'টোর জাগতিক অনেক প্রয়োজন, অনেক আব্দার হয়তো পূরণ করতে পারে নি কিন্তু ভালোবাসার মায়ায় রাশেদ আর আলো ওদেরকে ভরিয়ে রেখেছিল। কোনোদিন রাশেদকে রাগ করতে দেখেনি আলো। সংসারের টানাপোড়েনে যখন আলো মাঝে মাঝে বীতস্পৃহ হয়ে যেত তখন রাশেদ বুকের মাঝে আলোকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিত। প্রতি সন্ধ্যায় পরাগ আর পারুলকে পড়া দেখিয়ে দিত। ছুটির দিনগুলোতে ওদেরকে নিয়ে যেত যাদুঘরে, শিশু পার্কে, চিড়িয়াখানায়। মাঝে মাঝে আলোকে অবাক করে দিয়ে অফিসফেরত লুকিয়ে শাড়ি কিনে আনত। পরাগ-পারুল ঘুমিয়ে গেলে তারপর তুলে দিত আলোর হাতে। দামী কিছু নয় কিন্তু আলো বুঝতে পারতো সেই শাড়িটার প্রতি ভাঁজে কত গভীর ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। সেই রাতেই নতুন শাড়ি পরে সান্দ্র আশ্লেষে আলো জড়িয়ে ধরত রাশেদকে। ওদের মিলনটা শুধু দেহের মিলন ছিল না ওদের প্রতিটি অনুভব, প্রতিটি চেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চাইত। অশ্রুমাখা চোখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আলো সেই রাতগুলোর কথা স্মরণ করে। মনে হয় এইতো রাশেদ ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে ওর বাহু। শ্বাস নিচ্ছে ওর চুলের। আলোর সারা শরীর আবেশে শিউরে ওঠে।

ছেলেমেয়ে স্কুলে চলে গেলে সেদিন ছবিভাবীর সাথে গল্প করতে গিয়েছিল আলো। ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। বাড়ি এসে দেখল দরজার হুড়কোর মাঝে একটা খাম কে যেন রেখে গেছে। বেশ ভারী। বাদামী খামের ওপর রাশেদের নাম লেখা। কার কাছ থেকে এসেছে তার কোনো উল্লেখ নেই। তবে দেখে মনে হচ্ছিল গুরুত্বপূর্ণ কোনো চিঠি। আলো যত্ন করে আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েছিল আর ভুলে গিয়েছিল। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে আলোর মনে পড়ল চিঠিটার কথা। রাশেদকে দিয়ে রান্নাঘরে বাসনকোসন ধুয়ে সব গুছিয়ে শোয়ার ঘরে এসে আলো দেখল রাশেদ চিঠিটা হাতে নিয়ে পাথরের মতো বসে আছে বিছানার ওপর। রাশেদের মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই যেন প্রচন্ড আঘাতে ওর সমস্ত অনুভব বিবশ হয়ে গেছে।

আলোর বুকের ভেতরটা ধ্বক করে ওঠে, 'কি হয়েছে গো তোমার?' উৎকণ্ঠায় চিৎকার করে ওঠে আলো।

মায়ের চিৎকারে ছুটে আসে পরাগ-পারুল। রাশেদ কিছু বলে না। ওর শরীরে কোনো স্পন্দনও জাগে না।

পরাগ বলে, 'মা ওই চিঠিটা কি?'

রাশেদের হাত থেকে আলো আস্তে করে চিঠিটা বের করে নেয়। খুলে পড়ে আর ওর পায়ের নীচে পুরো পৃথিবী টলে ওঠে। ওর চোখদু'টো বিশ্বাস করতে চায় না ও যা পড়েছে। ঠিক পড়েছে তো ও? আবার পড়ে। তবু মন মানতে চায় না।

পারুল জিজ্ঞেস করে, 'কি লেখা আছে মা?'

পারুলের কথায় আলো সম্বিত ফিরে পায়। নিজেকে কোনোমতে সংবরণ করে বলে, 'কিছু না, তোরা যা।'

মায়ের এমন হিমশীতল গলা পরাগ-পারুল কোনো দিন শোনে নি। কোনো তর্ক না করে মাথা নীচু করে ওরা চলে গেল ঘর থেকে। আলো ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর এসে বসল রাশেদের পাশে।

রাশেদের বুকে হাত দিয়ে বলল, 'এর মানে কি? বল আমাকে এর মানে কি?'

রাশেদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমি জানি না। আমি এর কোনো মানেই খুঁজে পাচ্ছি না।'

আলো বলে, 'কি করবে এখন?'

'জানি না কি করব। আমার কি কোনো ধারণা আছে এ সময়ে কি করতে হয়? কালকে হাবিবের সাথে কথা বলব। দেখি ও কি বলে। তবে মনে হয় আমাকে যখন যাওয়ার সমন পাঠিয়েছে তখন যেতে হবে। মনে হয় কোনো উকিল ধরতে হবে।'

রাশেদের কথায় আলোর বুকটা ভয়ে হিম হয়ে ওঠে, 'কিন্তু তোমাকে কেন? এটা কি কোর্টের কোনো কেরানীর ভুল? তুমি গ্রামে যাও না তাতো অনেকদিন হতে চলল। সেই মা মারা যাবার সময় গিয়েছিলে তার পর তো ওদিকে পাও মারাও নি।'

'আমি জানি না আলো। তোমার মতো আমিও কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কোর্টে হাজিরা দেবার দিনতারিখ ছাড়া আর তো কিছুই লেখে নি সমনে।'

'লিখেছে, তুমি কি করেছো তা লিখেছে। এই রমজান আলী কে? তুমি কি চেন?'

'রমজান নামের কাউকে কোনোদিন চিনি না। আমাদের গ্রামে রমজান নামের কেউ ছিল বলেও আমার মনে পড়ে না। অন্ততঃ যতদিন আমি গ্রামে ছিলাম। তারপর ও নামের কেউ আসতেই পারে। এখান থেকে গ্রামে যেতে লাগে প্রায় সারা দিন। যে দিনটার কথা লিখেছে সে সময়তো আমি এক দিনও কাজ কামাই করি নি। ঢাকার বাইরেও যাইনি। তাহলে আমার নামটা কি করে ওরা ঢুকাল তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

আলো বলল, 'তুমি কালকে সকালেই হাবিবভাইয়ের সাথে দেখা কর। একদিন অফিসে দেরী করে গেলে কিছু হবে না। ব্যাপারটার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফয়সালা করা দরকার।'

রাশেদ বলল, 'হ্যাঁ যাব। চিন্তা করো না। এটা বিরাট একটা ভুল ছাড়া আর কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাতি নিভিয়ে আলো রাশেদের পাশে শুয়ে পড়ল। ওরা কোনো কথা বলছিল না কিন্তু দুঃশ্চিন্তায় দু'জনের কারুরই ঘুম আসছিল না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল প্রায়। কমলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আলো দেখল এক ঝাঁক পাখি নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। ওর মনে হল রাশেদ বলেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুই তো ঠিক হল না। ওই পাখিদের মতো রাশেদেরতো নীড়ে ফেরা হল না। জানালার গরাদে মাথা রেখে আলো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-৩

দুপুরে খাওয়ার পর আমবাগানে মাচার ওপর শুয়েছিল রতন। ফাল্গুনের মাঝামাঝি অথচ এখনই কি গরম পড়ে গেছে! গাছের পাতার ঘন বেষ্টনী ভেদ করে অবশ্য সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পারছিল না। বেশ আরামদায়ক ঠান্ডা হয়ে আছে বাগানের ভেতরটা। তার সাথে মাঝে মাঝে হাল্কা হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে রতনকে। রতনের মনে হচ্ছে যেন মিস মালা রাঙা ঠোঁট দিয়ে আদর করে যাচ্ছে ওকে। তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল রতনকে। স্বপ্নে ঘুরে ঘুরে আসছিল শুধু মিস মালা। কোন এক কাকের কর্কশ ডাকে ঘোর ভাঙল রতনের। আর মনমেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। টাকার অভাবের সমস্যার এখন পর্যন্ত কোনো উপায় খুঁজে পায় নি। আতর আলীর সাথে কথা বলবে না কি? যদি কোনো পথ বাতলে দিতে পারে? ভাবতে ভাবতে রতন নিজের অজান্তে পথ হাঁটে। কখন যে আতর আলীর বাড়ির সামনে চলে আসে রতন টের পায় না। গ্রামের মধ্যে আমিন মাতব্বরের বাড়িটাই শুধু দোতলা পাকা দালান। জানালা দিয়ে আতর আলী রতনকে দেখে।

'আরে, রতন মিয়া যে? ইদিক পানি কি মনে কইরে?'

'না কাজকাম নেই কিছু ভালো লাইগছিল না। তাই ভাইবলাম তুমার সাতে একটু গপসপ মেরে আসি।'

'ভালোই কইরেছ। দাঁড়াউ আমি নীচে আইসছি।'

আতর আলীর সাথে বাড়ির পেছনে পুকুরপারে এসে বসে রতন। আতর আলী হাতে করে একটা বাতাবী লেবু নিয়ে আসে। দা দিয়ে খোসা কেটে লাল কোয়া বের করে বাড়িয়ে দেয় রতনের দিকে,

'নাউ বাদাম খাউ। তা শহরের দিকে তো যাওয়া ছাইড়ে দিলা দেখি রতন মিয়া?'

'শরীরটা এখুনো যুত হয়নিকো। তা ছাড়া আরো একটা সমিস্যা আছে। তার জন্যিই তুমার কাছে এইসেছি।'

'সমিস্যা? খুইলে বুল আমারে। দেখি কোনো সমাধা কইরতে পারি কিনা।'

'তা হইয়েছে কি এই অসুখ হওয়ার পর চিকিৎসে কইরতে গিয়ে মেলা ট্যাকা খরচ হইয়ে গেছে। হাতে একটু পয়সাও নেই। শহরে যে যাবো তার কুনো উপায় দেইখছি না।'

আতর আলী হেসে ওঠে, 'এইটা কুনো সমস্যা হল? আমি তুমার বন্ধু মানুষ না? তুমার ট্যাকা লাইগবে তা আমারে আগে কেন বুল নি? দাঁড়াউ দিচ্ছি। কত লাইগবে তুমার?'

'দাউ কিছু। তবে আমি কিন্তু এখুন শোধ দিতে পাইরবো না নে। তাসে যদি জিতি তবে শোধ কইরে দিব না হইলে ধান ওঠা নাগাদ তুমারে অপিক্ষা কইরতে হবে।'

'কুনো চিন্তা করো না। হাজার টাকা দিচ্ছি তুমারে। হবে তো এতে?'

রতন না করে না। হাজার টাকা দিয়ে কয়েকদিনের শহরে যাওয়াটুকু তো হবে। তারপর যদি জিততে পারে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। একটাতো সুরাহা হল এখন মিস মালার দশ হাজার টাকা কোথা থেকে জোগাড় হবে সে উপায় ভেবে বের করতে হবে।

সেদিন আতর আলীর সাথেই শহরে যায় রতন। আতর আলীর হোন্ডার পেছনে চড়ে। পকেটে কড়কড়ে টাকা নিয়ে রতনের মনটা খুশীতে টগবগ করতে থাকে। আনন্দে বাতাবী লেবুর খালি খোসাটা মাথায় টুপির মতো পরে থাকে। মিস মালার গাওয়া গানটা গুন গুন করে কণ্ঠে ভেসে আসে। আতর আলী

শুধুই জুয়া খেলে। মেয়েমানুষের দোষ ওর নেই। সবাই বলে আতর আলী বাপের ভয়ে কোনো মেয়ের ঘরে যায় না। জুয়া খেলে কিছু পয়সা উড়াক তাতে আমিন মাতব্বরের আপত্তি নেই কিন্তু ঘরে বউ-পোলাপান রেখে ফষ্টিনষ্টি করবে সেই প্রশ্রয় আতরকে দেয়না মাতব্বর। আতর আলী জানে বেশী উল্টাপাল্টা করলেই বাপ তাকে ত্যাজ্য করে দেবে। তাছাড়া ওর নিজেরও খুব একটা মেয়েমানুষের টান নেই।

রতনকে কাঞ্চির ঘরে নামিয়ে আতর আলী চলে যায় তাসের আড্ডায়। এই পল্লীটা খুব একটা বড় নয়। শহরের উত্তর কোণে সরু গলির মাঝে পাঁচটা দালান জুড়ে এর বিস্তার। গোটা কুড়ি মেয়ে আছে এখানে। এর মাঝে কাঞ্চিকেই শুধু মনে ধরে রতনের। কাঞ্চির শরীরের সাথে বিয়ের সময়ের সখির কাঠামোর বেশ মিল পায় রতন। ছিপছিপে গঠন শরীরের কিন্তু ভরাট বুক। সুডৌল মসৃণ পেছন। চোখ দু'টো কাজলরাঙানো, টানা টানা। হাসির রোগ আছে কাঞ্চির। কারণে অকারণে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে কাঞ্চি। বুঝেছে নিয়তির সাথে যুদ্ধ করা চলে না। বাপ-মা মরা কাঞ্চিকে বার বছর বয়সে মাসির কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল ওর আপন কাকা।

মাসি ওকে বলেছিল, 'ওই যে বাইরের পিথিবীতে যে সব লোককে তুর আপন বলে জানিস তারা কেউ তুর আপন না। সবাই বইসে আছে কি করে তুকে খুবলে খুবলে খাবে। আমার কাছে থাক, ঠিকমত কাজকাম শেখ দেখবি ইখানের জীবনটা খারাপ না। মনটাকে সাদা রাইখে মানিয়ে নেবার খেলা।'

মাসির কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছিল কাঞ্চি। মেনে নিয়েছিল। এ পল্লীর অনেক মেয়েই সারা দিন কাঁদে। সন্ধ্যায় মুখে রং মেখে খদ্দের ঘরে তোলে কিন্তু মিলনের মজাটা উপভোগ করে না। খদ্দেরদের সাথে সময়টুকু কাঞ্চির বেশ আনন্দে কাটে। ও কথা বলতে ভালোবাসে। একটু একটু করে ভেতরের সব খবর বের করে নেয় কাঞ্চি। কত ধরণের লোক! কত ধরণের দুঃখ-বঞ্চনা-আনন্দ-বেদনা! কত বিভিন্ন কারণে তারা আসে কাঞ্চির কাছে! রতনের চোখে পড়ার পর কাঞ্চির সময়টা কাটছে আরো ভালো। বাঁধা খদ্দের থাকলে টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। রতন বেশ কিছুদিন না এলে কাঞ্চি অন্য খদ্দের ঘরে তোলে বৈকি তবে রতন যা দেয় তাতে সারা মাস ভালোই কেটে যায়।

আজ রতন ঘরে ঢুকতে কাঞ্চি অভিমান করে বলল, 'ইস এতদিন পর মনে পইড়ল আমারে? কুথায় ছিলে এতসময়? আমার কথা কি ইকটুও মনে পড়ে নি? যাউ তুমি আর আইসতে হবে নানে আমার কাছে।'

রতন হাসে। বলে, 'কিছুতো জানিস না খালি বুকনি ঝাড়িস। কি জ্বর হইয়েছিল রে! প্রায় মইরতে বইসেছিলাম।'

রতনের কথা শুনে চমকে ওঠে কাঞ্চি, 'হা রাম! বুল কি? ইখন ঠিক আছ তো?'

রতনের কাছে এসে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দেয়। বিয়ের পর সখি ঠিক এমনি করে রতনকে আদর করত। ছেলেমেয়ের তাড়নায় সে সব আদর কোথায় মিলিয়ে গেছে! রতন দু'হাত দিয়ে কাঞ্চিকে জড়িয়ে ধরে। অনেক দিন অসাক্ষাতের পর দু'জনের আবেগই উথলে ওঠে আজ। পাগলের মতো একে অপরের শরীর নিয়ে মাতে।

শরীর-মন ঠান্ডা হলে রতন একশ টাকার একটা নোট বের করে কাঞ্চির হাতে তুলে দেয়, 'শোন একটা বুতোল নিয়ে আয় দেখিনি। আমি তাসের আসরে যাইচ্ছি।'

তাসের আসর ওই দালানেরই দোতলায় একটা বড় ঘরে বসে। রতন আর আতর আলী ছাড়া আরো তিন-চারজন আছে নিয়মিত খেলুড়ে। আতর আলীর দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাই মঈনুদ্দীন, স মিলের মালিক কোরবান আলী, শিল্পা ট্রান্সপোর্টের মালিক হারান মন্ডল। তিনতাসের খেলা ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না রতনের। অন্য খেলায় মাথা খাটাতে হয়। এই একটা খেলা ভাগ্যে থাকলে জিত না থাকলে হার। বেশ কিছুদিন ধরে খেলতে খেলতে রতন একটু আধটু বোঝে কার হাতে কি আছে। ভালো

তাস হাতে এলেই হারান মন্ডলের বাঁ হাঁটুটা কাঁপতে থাকে। পছন্দমত হাত না হলে কোরবান আলী জুলফি ধরে টানে। আজ অনেকদিন পর খেলতে বসে রতনের আবার মনে পড়ে যায় সব নিশানা। ভাগ্যদেবীও সাহায্য করে ওকে। সেদিন বেশ কিছু জিতে ঘরে ফেরে রতন।

আতর আলীর টাকায় এভাবে মাস খানেক ভালোই চলে ওর। হারজিত হারজিত করে। তারপর সেই টাকাও তলানিতে এসে ঠেকে। দুশ্চিন্তা আবারো গ্রাস করে রতনকে। বাজারে বসেছিল রতন। দেখল মহি আসছে। সাথে চেনা চেনা একজন।

'চিনতে পেইরেছিস বন্ধু, শফিক মিয়া।'

নামটা শুনে রতনের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। মিস মালাকে পাবার চাবি এই লোকটারই তো হাতে। রতনকে দেখে হেসে ফেলে শফিক মিয়া।

তারপর বলে, 'এইটি তুমার কি রকম পীরিতি রতন মিয়া? এত দিন হইয়ে গেল মালারে একবার দেখতিও গেলা না? আমিতো মহিকে বুলিছি দশ হাজার ট্যাকা হইলেই আমি তিন দিনের জন্যি মালারে তুমার হাতে তুইলে দিব। তা তুমার তো কুনো খোজই নেই।'

রতন বলে, 'জ্বরে পড়েছিলেম। তা মিস মালা কুথায় এখুন।'

'এখুন তো সিজন শেষ। মালা বাড়ি চইলে গ্যাছে। আবার সামনের শীতে সিজন শুরু হইলে তারে দেইখতি পাবে। তবে তুমি যদি তারে চাউ তার বেবস্থা আমি এখনই কইরে দিতে পাইরব।'

শফিক মিয়ার কথা শুনে রতনের বুকের ভেতরটা ছলকে ওঠে। মিস মালাকে পাবে ও? কিন্তু টাকাটা দেবে কোথা থেকে?

'কি হইয়েছে জানো? অসুখবিসুখের চিকিৎসে করতি গিয়ে আমার হাতে এখুন কুনো ট্যাকা নেইকো। কি করি বুলতো?'

'এইটা কুনো কথা হল? তুমার এত বিরাট ধানী জমি। আমি তুমারে ধার দিচ্ছি। ধান উঠলে পর তুমি আমারে শোধ দিও।'

শফিক মিয়ার কথা শুনে রতন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, 'সত্য তুমি আমারে ধার দিবা?'

'তা দিব না কেন? শুধু যতদিন তুমি টাকা শোধ না দিইচ্ছ ততদিন জমির দলিলটা আমার কাছে বন্ধক রাইখবা।'

রতন রাজী হয়ে যায়। শফিক মিয়া বলে, 'আমার আইজকে অন্য কাজ আছে। আমি সামনের সপ্তায় আবার আইসবোনে তখুন তুমারে মালার কাছে নিয়ে যাব। তুমি সাতে কইরে দলিলটা নিয়ে আইস।'

রতন আনন্দে মশগুল হয়ে যায়। মিস মালাকে শেষমেষ সত্য সত্যই পাবে ও! দলিলটা তো একটা কাগজ মাত্র! ওটা হাত থাকলেই কি জমি শফিক মিয়ার হয়ে যাবে নাকি? বড় দাদার আমল থেকে এই জমি ওদের। আশেপাশের সবাই জানে। দাদা আর বাপ মিলে খুব ভালো সেচের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। খরা হোক, বাদল হোক ওদের জমিতে কখনো ফসলের আকাল আসে না। ধান উঠলে খুব সহজেই শফিক মিয়ার টাকা শোধ করে দিতে পারবে। তার বদলে তিন রাতের জন্য মিস মালা তো হবে ওর। রতনের বুকে অসংখ্য পায়রা একসাথে পাখনা মেলে উড়াল দেয়।

সেদিন রাতে ফুরফুরা মন নিয়ে রতন শহরে যায় আতর আলীর হোন্ডার পেছনে চড়ে। পকেটে মাত্র বিশটা টাকা আছে কিন্তু রতনের মন বলছে আজ ও নিশ্চয়ই জিতবে। কাঞ্চির ঘরে কিছুক্ষণ বসে রতন কিন্তু ওর মনটা টানতে থাকে তিন তাসের আসরে।

ও ঘরে ঢুকতেই আতর আলী বলে, 'এই জায়গা করো, জায়গা করো। আমাদিগের রতন মিয়ারে বইসতে দাও।'

তারপর বাংলার বোতলটা বাড়িয়ে দেয় রতনের দিকে, 'নাউ রতন মিয়া। আইজ তুমি আমার মেহমান।'

রতনের মনটা খুশীতে ভরে উঠল। এ না হলে বন্ধু। ভাগ্যিস নিজে থেকে ও আতর আলীর সাথে বন্ধুত্ব করেছিল। সেদিন ভাগ্যদেবীও যেন ভর করল রতনের ওপর। বেশ কিছু দান জিতল পর পর। খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে বাংলার বোতলটায় বড় বড় চুমুক দিতে থাকলো রতন। নেশাটা যখন বুঁদ হয়ে এসেছে তখনই পাল্লাটা ঘুরে গেল হঠাৎ। হার শুরু হল রতনের। যা জিতেছিল তা ফুরিয়ে গেল নিমিষেই। এ টুকুই তো শেষ সম্বল ছিল ওর। কাল থেকে কি হবে ওর? রাগে-দুঃখে নিজের চুল নিজেরই ছিঁড়তে ইচ্ছে করে রতনের।

আতর আলী টের পায় রতনের অবস্থা, 'ট্যাকা লাগবে নাকি বন্ধু? আমার কাছে আছে তুমারে দিচ্ছি। তবে ইর আগেও তো তুমারে ট্যাকা দিয়েছি মুখের কথায়। এইবার ট্যাকা নিতে হইলে তুমারে কাগজে দস্তখত দিতে হবে।'

রতন বিরক্ত হয় আতর আলীর কথায়, 'ট্যাকা নিতে হইলে কাগজে সই কইরতে হবে? ঠিক আছ। দাও সই কইরে দিই।'

আতর আলী বলে, 'এই নাউ ট্যাকা। কাগজ তো সাতে করি নিয়ে আসি নি। এই মঈনুদ্দীনকে বাড়িতে পাঠাচ্ছি। ও কাগজ ঠিক কইরে রাইখবে নে। তুমি যাবার সময় আমার বাড়িতে দাড়ায়ে সইটা কইরে দিও তারপর আমি তুমারে বাড়িতে নামায়ে দিব নে।'

রতন কোনো জবাব দেয় না। মুখ নীচু করে আতর আলীর কাছ থেকে টাকা নেয়। আতর আলী মঈনুদ্দীনের কানে ফিসফিস করে কি বলে আর মঈনুদ্দীন উঠে চলে যায় মুখে মিচকি হাসি নিয়ে। সেদিন বাকীটা সময় জিতের মধ্যেই কাটে রতনের। যা ধার নিয়েছিল তার পুরোটাই প্রায় রয়ে যায় পকেটে। মন খারাপ করাটা কেটে যায় রতনের। আতর আলীর হোন্ডাতে চেপে যখন ফিরে আসে তখন রাতের মায়াবী বাতাসে ওর নেশাটা আরো জাঁক দিয়ে ওঠে। বারান্দাতে মঈনুদ্দীন কাগজ নিয়ে বসেছিল। অনেকদিন চাচার বাড়িতে আছে মঈনুদ্দীন। খুব বিশ্বাসী। ভেতরের খবর অনেক কিছুই জানে।

আতর আলী রতনকে বলল, 'এই যে, এই খানে সই কর।'

রতন পড়েও দেখল না। চুপ করে সইটা করে দিল। আতর আলীর হাসিমাখা মুখটা চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠল। আনন্দে জড়িয়ে ধরল রতনকে।

সপ্তাহের বাকী দিনগুলো রতনের কাটলো শফিক মিয়ার অপেক্ষায়, আসন্ন প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায়। দুপুর নাগাদ পুকুরে ডুব দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে রতন, গায়ে তেল মাখছে এমন সময় মহি এসে খবর দিল বাজারে শফিক মিয়া এসেছে। রতনের আর তর সয় না। কোনো মতে ডুব দেয়। আজতো শফিক মিয়ার মিস মালার কাছে নিয়ে যাবার কথা ওকে। ধোয়া শার্ট আর প্যান্ট গায়ে দেয়। মাথায় তেল দিয়ে যত্ন করে আঁচড়ায় চুল। জমির দলিলটা বগলে নিয়ে মহির সাথে রওয়ানা দেয় বাজারের দিকে। চায়ের দোকানে শফিক মিয়া বসেছিল রতনের অপেক্ষায়।

ওকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'কি রতন মিয়া রেডী তো?'

রতন হাসিমুখে মাথা নাড়ে।

শফিক মিয়া বলে, 'দাও দলিলটা দাও দিখিনি। আর এই কাগজটা নাউ। দেখ লিখা আছে আমি তুমারে দশ হাজার ট্যাকা ধার দিয়েছি। তুমি শোধ দিলে দলিলটা ফিরত দিব। এই যে ইখানে একখান সই কর দিখি।'

রতন কাগজটা পড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। সই করে দেয়। শফিক মিয়া কার্বনের নীচের কাগজটা বের করে হাতে দেয় রতনের। কাগজটা ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে ভরে রতন। দলিলটা শফিক মিয়ার হাতে তুলে দেয়।

শফিক মিয়া বলে, 'চল তুমারে মালার কাছে নিয়ে যাই।'

শফিক মিয়ার হোন্ডা আছে। তার পিছে তুলে নেয় রতনকে।

বলে, 'খুব শক্ত কইরে ধইরে রাখ আমারে। অনেকটা পথ যেতে হবে।'

প্রায় ঘন্টা দুয়েক ধরে টানা চালায় শফিক মিয়া। উড়ন্ত বাতাসে রতনের প্রায় ঘুম চলে আসে। সমস্ত মন জুড়ে মিস মালার ফর্সা মুখটা, মাতাল হাসিটা ভরাট হয়ে থাকে। গ্রামের এক কোণে ছোট একটা বাড়ির সামনে শফিক মিয়া এসে থামে।

'মালা বাড়ি আছো নাকি?' জোরে ডাক দেয়।

কোনো সাড়া আসে না। উঠোনটা পার হয়ে দেখে শেকল দিয়ে আটকানো দরজায় ছোট একটা টিপতালা লাগানো।

শফিক মিয়া বলে, 'আরে মালা আবার কুথায় গেল? চল সামনের বাড়িটায় খোজ কইরে দেখি জানে কিনা।'

সামনের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল মালা নাকি দিন তিনেক আগে ওর মামার বাড়ি গেছে। বলেছে বেশ কিছুদিন থাকবে। তবে ওর মামার বাড়ি কোন গ্রামে তা কেউ জানে না। খবর শুনে রতনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

শফিক মিয়া বলল, 'আরে মেলাই ভাইবছ তুমি রতন মিয়া। আরে মালাতো কিছুদিন পরই ফিরে আইসবে। তখুন আমি তুমারে আবার নিয়ে আসবো নে। চল তুমারে বাসে তুইলে দেই। মালা আসলে পর তুমারে খবর পাঠাবো নে।'

ফিরতি বাসটা লোকাল। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল রতনের। জীবনে এত হতাশ কখনো হয়নি ও। শফিক মিয়া ওর জ্বলন্ত ক্ষুধায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। বাস স্ট্যান্ডে এসে দেখল ওদের গ্রামে যাবার শেষ নৌকাটা চলে গেছে। বাস স্ট্যান্ডের পাশে একটা রাইস মিলের ছাউনির নীচে বসে সারা রাত কাটিয়ে দিল রতন। জীবনে কোনো কিছু চেয়ে পায়নি তা কখনো হয় নি। এই প্রথম ওর চোখের সামনে থেকে রসালো ফলটা কে যেন কেড়ে নিল। রাগে-দুঃখে চোখ ফেটে জল চলে আসছিল রতনের। ঘুম আসছিল না চোখে। শেষ রাতের দিকে তন্দ্রার মতো এসেছিল কিন্তু তা কেটে গেল ঠান্ডা বাতাস আর বৃষ্টিতে। রতন টের পেল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে ওর। মুখটা তিতকুটে হয়ে আছে। বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে থাকলো রতন। ঘাটে এসে ভিজতে ভিজতে অপেক্ষা করতে থাকলো গ্রামে ফেরার প্রথম নৌকার।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-৪

মন খারাপ হলেই আলোর মনে পড়ে যায় বাসর রাতের কথা। কুড়ি বছর হতে চলল। ও আর রাশেদ সারা রাত ধরে গল্প করেছিল। ওই প্রথম রাতেই ওরা পরস্পরকে বুঝে নিয়েছিল। সমঝোতার আর ভালোবাসার বন্ধনটা তৈরী হয়েছিল।গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে রাশেদ ঢাকায় এসেছিল গ্রাম সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে জায়গীর নিয়ে। দু'টো ছোট ছেলেকে পড়াতে পড়াতে বি.কম. পাশ করল। তারপর ঢুকে গেল সোনালী ব্যাংকের চাকুরীতে। ওদের পাশের বাড়িতে থাকতো হাবিব। রাশেদের সমবয়সী। বন্ধুত্ব হতে বেশীদিন দেরী হয়নি ওদের। সামাজিক অবস্থানে খুব একটা তফাত ছিল না। হাবিব এল. এল. বি. পাশ করে একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞের সহকারী। ব্যস্ত মানুষ। রাশেদ চাকুরী পাবার পর হাবিব ওর ফুফাতো বোন আলোর সাথে সম্বন্ধ করল রাশেদের। বিয়ের আগে একদিন এক ঝলক দেখেছিল আলো রাশেদকে। সাধারণ ভদ্র চেহারা। বাসর রাতে রাশেদের কথা শুনে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল আলোর। খুব মায়া জড়িয়ে কথা বলতে পারতো রাশেদ। আস্তে আস্তে ভরাট স্বরে। মোহ ছিল সেই স্বরে।

রাশেদ বলেছিল, 'জানো আলো আমি ঘর ছেড়েছিলাম বাবার উপর রাগ করে। আমার বাবা। কিন্তু সেই মানুষটাকে আমি কোনোদিন শ্রদ্ধা করতে পারি নি। মা খুব নরম মনের মানুষ ছিল। বাবার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস ছিল না কোনোদিন। আর বাবাও কোনোদিন মার সাথে ভালোবেসে, সম্ভ্রম করে কথা বলে নি। শুধুই আদেশ। শুধুই স্বামীর সেবা করে যাওয়া। মা কেন জানি কখনোই বাবাকে সন্তুষ্ট করতে পারতো না। বাবা সারাক্ষণ বকাবকি করতো। প্রায়ই গায়ে হাত তুলত। মা খুব আদর করতো আমাকে আর সেই আদরে বাবার প্রতি আমার রাগটা আরো বাড়তে থাকতো। আমিও মার মতোই নরম ছিলাম। রাগ হতো কিন্তু চুপ করে সব সহ্য করতাম। মাথা নীচু করে বাবার সব কথা শুনতাম। যখন দশ বছর বয়স তখন মা জ্বরে পড়ল। ঘুনঘুনে জ্বর। আসতো রাতের দিকে। অনেকদিন ধরেই জ্বরটা চলছিল কিন্তু মা কাউকে বলে নি। একটু একটু কাশি ছিল। খেতে ভালো লাগতো না। একটুতে ক্লান্ত হয়ে যেত। কিন্তু বাবাকে কখনো টের পেতে দিত না। একদিন সবাই আমরা খেতে বসেছি। মা ভাত বাড়তে বাড়তে হঠাৎ কাশির দমকে উঠে গেল। উঠোনের কোণে উপুড় হয়ে এক নাগাড়ে কাশতে লাগল অনেকক্ষণ। বাবা বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে দেখল কাশির সাথে রক্ত বের হয়ে মাটি ভেসে যাচ্ছে। তারপর মাসখানেক বেঁচেছিল মা। যক্ষা হয়েছিল। কোনো ওষুধে কোনো কাজ হয় নি। মা চলে যাবার পর কিযে শূন্য লাগতো সব কিছু! কি হল জানো? মা চলে যাবার এক মাসের মাথায় বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে আনলো। আমি কিছু বলতে পারিনি কিন্তু বাবাকে ক্ষমাও করতে পারিনি। জন্মদাতা পিতাকে ভালোবাসতে না পারা, শ্রদ্ধা করতে না পারাটা খুব কষ্টের! ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার সাথে সাথে আমি ঢাকায় মুনীরমামার বাড়ি চলে এলাম। বাবা বাধা দেয়নি। মনে হয় খুশীই হয়েছিল। সৎমা আমাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখতো না। বাড়ি ছাড়ার সময় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি আমার বাবার মতো হবো না। আমি যদি কোনোদিন বাবা হই তাহলে আমার সন্তানদের ভালোবাসা-মায়ায় ভরিয়ে রাখবো। কোনোদিন যেন আমার প্রতি ওদের ঘৃণা না হয়। আর আমার ঘর আলো করে যে আসবে তাকে আমি রাণী করে রাখবো।'

কি যে ভালো লেগেছিল কথাগুলো শুনে আলোর! রাশেদের জন্য করুণা-মায়া-ভালোবাসা সব একসাথে উছলে উঠেছিল। কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে ভালোবাসার সেই বোধটা এক রকম টানটান ছিল। কখনো তার কমতি হয়নি। যে মানুষটা আলোর পুরো অনুভব দখল করেছিল তাকে আজ মাটির নীচে শুইয়ে দিয়ে এসেছে সে কথা মনে হতেই চোখ চিড়ে প্লাবন উঠল আলোর। যে মানুষটা কোনোদিন কারো ক্ষতি করে নি তার জীবনটা কেনো বিনা অপরাধে এ রকম ঝাঁঝরা হয়ে গেল তা কিছুতেই আলোর বোধগম্য হয় না। ও বুঝে উঠতে পারে না এ কিরকম অন্যায় বিধান আল্লাহর।

চিঠিটা হাতে নিয়ে পরদিন সকালেই রাশেদ গিয়েছিল হাবিবের কাছে। আলোর খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল সাথে কিন্তু ছেলে-মেয়েকে স্কুলের জন্য তৈরী করে দিতে হবে।

বিকেলে রাশেদ ফিরলে পরে আলো শুনলো হাবিব কি বলেছে, 'শোন এটা খুনের মামলা। খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে। তোকে কেউ একজন ফাঁসিয়েছে। তুই একজন লোকাল উকিল খুঁজে বের কর যে কোর্টের হাল-হকিকত ভালো করে জানে। যদি টাকা-পয়সা দিতে হয় তাহলে জানবে কাকে দিতে হবে। তোর হাজিরার তারিখতো এখনো সপ্তাহ দু'য়েক বাকী আছে। তুই এর মধ্যে এই প্রস্তুতি গুলো শেষ কর। তারপর দেখা যাক জল কোথায় দাঁড়ায়।'

রাশেদ বলল, 'শোনো আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। কালকে গ্রামে যাব। বাবার আমলে একজন মোক্তার ছিলেন আমি চিনি। প্রথমে উনার সাথে কথা বলব। দেখি উনি কি বলেন। তুমি এদিকটা সামাল দিতে পারবে না এ ক'দিন?'

আঁচলে চোখ মুছে আলো মাথা নাড়ল।

ব্যাংকে কিছু টাকা জমানো ছিল। তা থেকে কিছু নিয়ে রাশেদ পরদিন চলে গেল গ্রামে। ফিরল তিনদিন পর। এই তিনদিন উৎকণ্ঠায় এক মুহূর্তও ঘুমাতে পারে নি আলো।

রাশেদ বলল, 'রবি মোক্তার কেসটা নিয়েছেন। উনি নিজেও ভালো করে জানেন না কি ঘটনা ঘটেছে। আমাকে বললেন চলে আসতে। এর মধ্যে খোঁজখবর করে উনি কেসটা বুঝবেন। হাজিরার দিন আমাকে আবার যেতে বলেছেন।'

আলো জিজ্ঞেস করল, 'কি হতে পারে উনি কি বলেছেন?'

'নাঃ উনি তো এখনো জানেনই না ঠিক ঘটনাটা কি। বাড়িতেও কেউ ঠিক করে বলতে পারলো না কি ঘটেছে। বৌমাতো বাপের বাড়ি। আর রতন তো উধাও হয়ে গেছে। গ্রামের অর্ধেক লোক পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গেছে। যারা আছে তারাও কেউ মুখ খুলছে না যদি পুলিশ এসে ধরে।'

সারারাত বাসে করে এসে সকালে রাশেদ হাজিরা দিল আদালতে। মামলা দায়ের করেছে সরকার। বিবাদী অনেকজন। রাশেদ চিনতে পারলো আমিন মাতব্বর আর তার ছেলে আতর আলীকে। শহর থেকে উকিল নিয়ে এসেছে ওরা। আরেকজন লোককে চিনতে পারলো না রাশেদ কিন্তু চাল-চলন দেখে মনে হল টাকার গরম আছে। আর রতনের তো কোনো খোঁজ নেই। রবি মোক্তার বসলেন রাশেদের পাশে।

বললেন, 'তুমাদের ধানী জমিটা দখল করা নিয়ে গন্ডগোল বাইধছে। আমিন মাতব্বর বুইলতেছে রতন তার কাছ জমি বিক্রি কইরছে। আর উই যে দেইখতেছো উর নাম শফিক মিয়া। যাত্রাদলের মালিক। উ বুইলছে রতনের কাছ থিকে উ জমি কিনিছে। দুই পক্ষেই লেঠেল নিয়ে জমি দখল কইরতে গেছে। লাঠির বাড়ি খেয়ে শফিক মিয়ার দলের রমজান মারা গেছে। জমির অদ্ধেক মালিক তো তুমিও। তাই সরকার তুমার নামেও কেস দিয়েছে।'

মামলা বসেছে শহরের জেলা আদালতে। ওদের গ্রামটা নিরুত্তেজ চুপচাপ। মাঝে মাঝে দু' একটা ছোটখাট ডাকাতি হয় এ টুকুই। খুনের ঘটনাটা এ গ্রামে এই প্রথম। তামাশা দেখার জন্য গ্রামের

প্রায় অর্ধেক লোক ভিড় জমিয়েছে আদালতে। আদালতের ভেতর থেকে উপচে পড়ে লোক ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের প্রাঙ্গনে। সেশন জজ এলেন কিছুক্ষণ পরে।

সরকারী উকিলের কাছ থেকে কেসটা সম্পর্কে শুনলেন, 'মহামান্য আদালত এটা খুনের মামলা কিন্তু তার চেয়েও অনেক জটিলতা আছে এই মামলায়। জমির মালিকানা নিয়ে গন্ডগোল। শান্তিপুর গ্রামের রতন মিয়া আর তার বড় ভাই রাশেদ মিয়া জমির মালিক। সেই গ্রামের আমিন মাতব্বর আর মাছপাড়া গ্রামের শফিক মিয়া দু'জনেরই দাবী হচ্ছে রতন মিয়া জমিটা তাদেরকে বিক্রি করেছে। জমির দখল নিতে আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়া হাজির হলে তাদের মধ্যে সংঘাত হয়। সেই সংঘাতে মাথায় লাঠির আঘাতে মৃত্যুবরণ করে শফিক মিয়ার কর্মচারী রমজান আলী। সেই ঘটনার সময় রতন মিয়া আর রাশেদ মিয়া সেখানে উপস্থিত ছিল কিনা তা এখনো পরিষ্কার নয়। তাছাড়া কার লাঠির আঘাতে রমজান মিয়ার মৃত্যু ঘটেছে পুলিশের অনুসন্ধানে তাও খুঁজে বের করা যায়নি। রতন মিয়া একই জমি কেন আর কিভাবে দু'জনকে বিক্রি করল তাও জানা যায় নি। আশা করি মামলা চলাকালীন সাক্ষীসাবুদের জবানবন্দীতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলবে আর দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পাবে।'

এরপর এক এক করে পালা এল আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়ার উকিলের। ওরা দু'জনেই দাবী করলো জমির মালিকানা। আমিন মাতব্বরের উকিল বের করে আনল একটা কাগজ যাতে রতন আর দু'জন সাক্ষীর সই আছে। সেই কাগজে লেখা আছে রতন ওদের সবচেয়ে বড় ধানী জমিটি আমিন মাতব্বরের কাছে বিক্রি করেছে। জমির দাগ নম্বর, সীমারেখা সব স্পষ্ট করে বর্ণনা করা আছে। শফিক মিয়ার উকিলও বের করে আনল একটা কাগজ। রতনের সই আছে তাতে। লেখা আছে রতন ওদের ধানী জমিটা বিক্রি করেছে শফিক মিয়াকে। কাগজটাতে জমির কোনো বর্ণনা নেই কিন্তু তার চেয়েও বড় জমির দলিলটা শফিক মিয়ার কাছে আছে। দু'জনেরই বক্তব্য জমি দখলের সময় রতন আর রাশেদ দু'জনেই ওখানে ছিল এবং তারাই ষড়যন্ত্র করে রমজান আলীর মাথায় লাঠি মেরেছে। এটা পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত যাতে এই গন্ডগোলের মাঝে টাকা নিয়েও জমিটা হস্তান্তর না করতে হয়। রতন আর রাশেদ দু'জনেই দোষী তবে যেহেতু রতন উধাও কাজেই জমির পূর্ব মালিক হিসেবে সব দোষ এসে পড়ল রাশেদের ঘাড়ে।

রবি মোক্তার তার জবানীতে জানালেন যে রাশেদ গত প্রায় দু' বছর ধরে গ্রামে যায় না। এমনকি কাগজে-কলমে জমির অর্ধেক মালিক হলেও ও কিছুই ভোগ করে না। তাছাড়া সে সময় রাশেদ ঢাকায় ছিল এবং কোথাও যায়নি। ওর অফিসের হাজিরা খাতা দেখলেই তার প্রমাণ মিলবে। রতন যে জমি বিক্রি করেছে সে বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই রাশেদের। প্রথম দিন শুধুই চলল মামলার বয়ানী। তারপর বিবাদীদেরকে হাজতে ভরা হবে কিনা সেই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত সবাইকেই জামিন দিতে রাজী হলেন জজ। রাশেদের জামিন ধার্য হল পনের হাজার টাকা। জমানো টাকার একটা বড় অংশ বের হয়ে গেল জামিন দিতে। তিন সপ্তাহ পরে আবার মামলার তারিখ পড়ল। সেদিন সাক্ষী-সাবুদ হাজির করা হবে।

তিন সপ্তাহ পরে রাশেদ আদালতে হাজির হয়ে দেখল সরকারী উকিল অসুস্থ। আবার নতুন করে দিন-তারিখ ঠিক হল। সেদিন দেখা গেল হাকিম নিজেই অনুপস্থিত। পরের বার অন্য বিবাদীরা কেউ হাজির হল না। প্রতিবার রাশেদ সারা রাত বাসে করে গিয়ে হাজিরা দেয় আবার বিমর্ষ মুখে সেই রাতেই ফিরে এসে সকালে অফিস করে।

রবি মোক্তার বলেছেন, 'শুনো রাশেদ, আর কেউ আসুক আর না আসুক তুমারে আইসতেই হবে। তুমি আর রতন হইতেছ প্রধান আসামী। তুমি যদি হাজিরা না দাউ তাহলে তুমার জামিন নাকচ কইরে জেলে ভরে দেবে।'

এ ভাবে প্রায় ছ' মাস পার হয়ে গেল। মামলা কোনো দিকে এগোয় না। রবি মোক্তারের ফি আর যাতায়াতের খরচ দিতে দিতে জমানো টাকা প্রায় সবটাই শেষ হয়ে এসেছে। আলো টের পায় ওর ভালোবাসার মানুষটি ভেতরে ভেতরে ভাঙছে। রাশেদ প্রাণপণ চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকার, ছেলে-মেয়ে-আলোর সাথে হাসিমুখে কথা বলার। কিন্তু আলো বোঝে রাশেদ রাতে ঘুমাতে পারে না। ভাবনায় আনমনা হয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্নের তাড়নায় ধ্বক করে উঠে বসে। ওর ঋজু শরীরটা ন্যূব্জ হয়ে যাচ্ছে উৎকণ্ঠার ভারে। যতদিন যাচ্ছে রাশেদের আত্মবিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসছে। আলোর ভীষণ ভয় হয়। ভবিষ্যতে কোনো রশ্মি দেখতে পায়না ও।

প্রায় তিন বছর পার হয়ে গেল এভাবে। হয়তোবা ছ' মাসে একবার ঠিকমত আদালত বসে। কিছু সাক্ষীর সওয়াল হয়। আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়ার উকিলেরা খুবই ধুরন্ধর। তারা কথার মারপ্যাঁচে সব দোষ শুধু রাশেদের ওপরই চাপায় না বরং চাক্ষুষ সাক্ষীর বয়ানে প্রমাণ করে যে ঘটনার দিন রাশেদ স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিল এবং রাশেদ নিজের হাতেই রমজানের মাথায় লাঠির বাড়িটা মেরেছে। বুড়ো রবি মোক্তার কোনো উপায়েই সেই ক্রমবর্ধমান গহ্বর থেকে রাশেদকে বের করে আনতে পারে না।

রাশেদ রবি মোক্তারকে বলে, 'বৌমাকে কি সাক্ষী দিতে আনা যায়? ও যদি বলে গ্রামের সাথে, জমিজমা ভোগ করার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাতে হয়তো কাজ হতে পারে।'

রবি মোক্তার বলেন, 'চল, বৌমাকে যেয়ে বলি। দেখি রাজী হয় কিনা।'

সেদিন আদালতে শেষে রাশেদ আর রবি মোক্তার সখির বাপের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। কাছাকাছির মেয়ে সখি। দু'টো গ্রাম পড়ে ওদের বাড়ি। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। বাড়িতে সখির বাপ-ভাই সবাই ছিল।

রাশেদ এসে পরিচয় দিতে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সখির বাপ, 'কি চাও কি চাও আর তুমরা? ওই হতভাগা রতনতো সখির জীবন কালি করে দিয়েছে। এখুন শুনছি খুন কইরে ফেরার হয়েছে। স্বামী-সংসার থাকতে মেয়েটা আমার বাপের বাড়ি এসে উঠেছে। আর কত যইন্ত্রনা দিবে তুমরা আমাদের?'

রাশেদ চুপ করে থাকে। বাপের কাছে ভাসুরকে বকা খেতে দেখে সখি বের হয়ে আসে ভেতর থেকে।

বলে, 'বাবা, উনি কিন্তু কিছু জানেন না। উনিতো গ্রামেই আসেন না কত দিন! উনার কুনো দোষ নেইকো।'

তারপর রাশেদকে বলে, 'কেনো এইসেছেন ভাইজান? কুনো দরকার আছে কি?'

রাশেদের আগেই রবি মোক্তার জবাব দেন, 'মারে, তুমি তো জানো তুমার ভাসুর কারো সাতেপাচে নেই। জমির অদ্ধেক মালিক উ কিন্তু একটা দানাও তো ভোগ করে না। তুমার স্বামীর সাতে সাতে সরকারের উকিল তুমার ভাসুরকেও খুনের আসামী বানিয়েছে। এখুন তুমি যদি একবার কষ্ট কইরে আদালতে গিয়ে বল তুমার ভাসুর সেই সময় গেরামে ছিল না তাতে হয়তোবা উর উপকার হইতে পারে।'

রবি মোক্তারের কথা শুনে সখির বাপ চিৎকার করে ওঠে, 'না, আমার সখির উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। উকে আর আপনারা টানাটানি কইরবেন না। আর বাড়ির বউ হইয়ে ও যাবে আদালতে সাক্ষী দিতে? মান-সম্মান কুথায় থাকবে আপনাদের?'

রবি মোক্তার বলেন, 'ভাইটি, এখুন তো মান-সম্মানের প্রশ্ন নয়, এখুন জীবন বাচানোর তাগিদ। বিনা অপরাধে রাশেদ মিয়া যদি জেলে যায় সেইটাকি আপনার ভালো লাগবে?'

'বিনা অপরাধে কারুর শাস্তি হয় না। দেশে আইন-কানুন আছে। কেউ যদি নিরপরাধ হয় নিশ্চই তারে ছাইড়ে দিবে। তার জন্যি আমার সখিরে আমি আদালতে পাঠাইতে পাইরব না।'

বাপের কথায় সখি মাথা নীচু করে ঘরে চলে যায়। রাশেদ আর রবি মোক্তার মাথা নীচু করে বাস স্ট্যান্ডে ফিরে আসে। রাত হয়ে এসেছিল। বাস স্ট্যান্ডে এসে দেখল শহরে যাবার শেষ বাসটা চলে গেছে। আজ রাতে আর ঢাকায় ফেরা হবে না রাশেদের। কালকে অফিস করা হবে না আর। এভাবে চললে চাকরিটা থাকবে তো ওর? আলো তো ভাববে রাশেদ ফিরে আসবে কাল। না এলে নিশ্চয়ই খুব ভাববে। নানা চিন্তা রাশেদকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রবি মোক্তারের সাথে রাশেদ গ্রামে ফিরে আসে। রতন-সখি কেউ নেই। জমিজমার দেখভাল করতো জয়নাল আর ঘরের কাজে সাহায্য করতো শহীদ। ওরাই এখন বাড়িটায় থাকে। রাশেদকে ঘরে ফিরতে দেখে বিছানা পেতে দিল শহীদ। ওদের সাথে ডাল আর কুমড়োর তরকারী দিয়ে ভাত খেলো রাশেদ।

বিছানায় শুয়ে নানান চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল রাশেদ। ওর চোখদু'টো থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল। কি আছে ভবিষ্যতে? ওকে কি সত্যি সত্যিই জেলে যেতে হবে? কি হবে তাহলে আলো-পরাগ-পারুলের? পরাগ-পারুল কিভাবে মানুষের কাছে মুখ দেখাবে? কি করে বলবে ওদের বাবা খুনের অপরাধে জেল খাটছে? মামলা শুরু হবার পর থেকে বানের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। জমানো টাকা শেষ, আলোর গয়নায় হাত পড়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেও লোন নিতে হয়েছে। ও না থাকলে কি করে সংসার চলবে? আচ্ছা মামলাটাতো খুনের? ওর কি ফাঁসী হয়ে যাবে? কিন্তু আলোকে ছেড়ে পরাগ-পারুলকে ছেড়ে ওতো কিছুতেই মরতে চায় না। বিছানায় শুয়ে রাশেদ এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। আধো তন্দ্রায় স্বপ্নে একটা দুমুখো সাপ আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়ার চেহারা নিয়ে বিরাট হাঁ করে গিলতে আসে ওকে। একবার এ চেষ্টা করে রাশেদকে গ্রাস করার আবার ও। দুই মুখের মাঝে রাশেদ নিরন্তর ছুটাছুটি করে মরে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এমন সময় সাপের মাথার উপর দিয়ে ভেসে আসে জজের হাতুড়িটা। টেবিলে সজোরে আঘাত হেনে হাসতে হাসতে জজ বলতে থাকেন, 'আসামী রাশেদ হাজির, আসামী রাশেদ হাজির, আসামী রাশেদ হাজির।'

ঘেমে নেয়ে উঠে ঘুম ভেঙে যায় রাশেদের। প্রথমে বুঝতে পারে না কোথায় আছে ও। কতদিন পর বাড়িতে থাকলো ও! সেই সৎমা মারা যাবার পর সপরিবারে বাড়ি এসেছিল শেষ। রাশেদ উঠে ঘুরে ঘুরে দেখে। এই রান্নাঘরের সামনে বসে মা সব্জি কাটতো আর রাশেদ মার আঁচলের নীচে বসে নামতা পড়ত। এই কদম গাছটা রাশেদ নিজে পুঁতেছিল। কত বড় হয়ে গেছে গাছটা! ছোটবেলার অসংখ্য স্মৃতি এসে রাশেদকে আপ্লুত করে ফেলল। কতদিন এই স্মৃতিগুলো মনে করে না রাশেদ! যেন অন্য কোনো সময়। অন্য কোনো জীবন। ভোর হয়ে এসেছিল প্রায়। রাশেদ মুখ ধুয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পারে চলে এল। প্রথম নৌকাটা ধরবে। সকাল আটটা নাগাদ ঢাকায় ফেরার একটা বাস আছে। সেটা ধরতেই হবে।

গত তিন বছরে রাশেদের বয়স যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে ও। নিরন্তর ঘুমহীনতা আর দুঃস্বপ্নে ওর চোখের নীচে পড়েছে ঘন কালি। একদিন হঠাৎ বাথরুমে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল রাশেদ। পাড়ার ডাক্তার দেখে বললেন রাশেদের রক্তচাপ বেড়েছে। রক্ত পরীক্ষা করে ধরা পড়ল ডায়াবেটিস। অনেক ওষুধ দিলেন রাশেদকে। বললেন চিন্তামুক্ত নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে। তা শুনে এত উৎকণ্ঠার মধ্যেও হাসি এল রাশেদের।

আলোকে ডেকে বলল, 'আমার চিন্তাগুলো যদি কাউকে দিয়ে দিতে পারতাম।'

আলোর বুক ভেঙে কান্না এল। এই তিন বছরে ওর গায়ের সব গুলো গয়না বিক্রি হয়ে গেছে। চেনা-পরিচিতদের কাছ থেকে ছোট ছোট ধার-দেনাও শুরু হয়েছে। ভাগ্যিস রাশেদের চাকুরীটা সরকারী। তাই এখনো টিঁকে আছে। বেসরকারী ব্যাংক হলে এত ছুটি নিলে কবে চাকুরী চলে যেত। কিন্তু এত কিছুর পর যদি আলো জানতো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে তা হলে বর্তমানের এই দুঃসময়টাকে মেনে নিতে পারতো আলো। কিন্তু রাশেদের কাছে যখন শোনে তখন আলো বোঝে অবস্থাটা ক্রমশই রাশেদের

প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। কি হবে সবশেষে? রাশেদকে কি জেলে যেতে হবে? কি করবে তখন আলো? এই নিরন্তর ত্রিশঙ্কুর মতো ভয়ের দোলনের মাঝে একদিন পাশের বাড়িতে ফোন এল একটা।

বাজারের ফার্মেসী থেকে রবি মোক্তার ফোন করেছেন, 'ভালো খবর আছে। রাশেদ তুমি একখনই আসো।'

অনেকদিন পর অন্ধকার গহ্বরের শেষে আশার আলোর রেখা যেন দেখতে পেল আলো। বন্যার স্রোতে ভাসতে ভাসতে একটা শক্ত ডাল যেন হাতের কাছে পেল ও।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-৫

আবার ভয়ানক জ্বর আচ্ছন্ন করল রতনকে। মিস মালাকে বাড়িতে না পেয়ে সেরাতে যে জ্বরে পড়েছিল তা ওকে এবার ভোগালো টানা একটা মাস। শরীর কাঁপানো জ্বর। কপালে হাত দিলে মনে হতো আগুন জ্বলছে। বাজারের মিলন ফার্মেসীর সমীর ডাক্তার বাড়ি বয়ে দেখে গেলেন রতনকে।

রতনের বুকটা ভালো করে শুনে বললেন, 'মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। একটা ওষুধ দিচ্ছি দেখা যাক কমে কিনা। না ভালো হলে ওষুধ বদলে দেব। তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।'

খুব কড়া ওষুধ। সারাক্ষণ মাথা ঘোরাতো রতনের। উঠে দাঁড়াতে পারতো না। সেটা ওষুধের প্রকোপে না জ্বরের তাড়নায় তা বুঝতে পারতো না রতন। টানা দশ দিন ওষুধ খেয়ে জ্বরটা মোটামুটি নেমে এসেছিল। কিন্তু দিন দু'য়েক পর আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। এবার ডাক্তার ওকে ইনজেকশন দিলেন। পরপর পাঁচ দিন কম্পাউন্ডার বাড়ি এসে লুঙ্গি তুলে রতনের নিতম্বে মোটা সুঁই ফোটাল। কি ভীষণ ব্যথা! দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করত রতন। মুখ থেকে রুচি উঠে গিয়েছিল পুরোপুরি। কিছু খেতে পারতো না। ভয়ানক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। অসুখ আর ওষুধের সম্মিলিত ক্রিয়ায় রতনের চেতনা একটা ঘোরের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। কোনো স্বপ্ন-কল্পনা সেখানে ভাসতো না। শুকিয়ে প্রায় কাঠি হয়ে গেল রতন। শরীরটা প্রায় মিশে গেল বিছানার সাথে। সখি খুব যত্ন করছিল রতনের। বিভিন্ন রকম সুরুয়া তৈরী করে চামচ দিয়ে দিয়ে রতনের মুখে তুলে দিত। মাথা ধুইয়ে গা মুছে দিত। চুলে বিলি কেটে দিত। কিন্তু রতন বুঝত এই যত্নটার মাঝে ভালোবাসা নেই। শুধুই স্ত্রীর কর্তব্য করে যাওয়া।

ইনজেকশনে কাজ হয়েছিল। জ্বরটা পুরো ছেড়ে গিয়েছিল দিন তিনেক। হাঁটা-চলার শক্তি একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছিল রতন। আস্তে আস্তে হেঁটে এসে আমবাগানে মাচার ওপর শুয়ে ছিল। স্বপ্ন-কল্পনায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল। মিস মালা-কাঞ্চি-জুয়োর আসর সব মিলে মিশে ওর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হঠাৎ আমবাগানের সুনশান নৈঃশব্দ্য তছনছ হয়ে গেল কার যেন ত্রস্ত দৌড়ের শব্দে। রতন দেখল মহি আসছে প্রাণপণ দৌড়াতে দৌড়াতে। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

রতনের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সর্বনাশ হইয়ে গেছে বন্ধু। আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়া দু'জনেই লেঠেল নিয়ে এসেছে তুর জমি দখল কইরতে। তুই নাকি দুজনার কাছেই জমি বেচিছিস? লাঠালাঠিতে শফিক মিয়ার দলের রমজান বেজায় চোট পাইছে। গায়ের কাপড় যে রকম লাল হইয়ে গেছে মনে হয় বাইচবে নানে। এখুন উরা তুরে খুজছে। আমি দৌড়ে আইসছি তুকে বুলবার জন্যি। তুই পালা। খুজি পাইলি তুরেও শেষ কইরে দিবে।'

রতন লাফ দিয়ে ওঠে। কোথায় পালাবে ও? এই দুপুরবেলায় যেদিকেই যাক না কেন ওরা তো ওকে খুঁজে পাবেই। রতনের মনে পড়ে মিত্তিরদের মন্দিরের পেছনে দুই দেয়ালের মাঝে ছোট একটা ফোকড় আছে। ছোটবেলা অনেক লুকিয়েছে সেখানে। ওখানে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট ফুঁকেছে। গাছের আড়ালে আড়ালে রতন দৌড়ে যায় মন্দিরের দিকে। দুর্বল শরীর চলতে চায় না। শুনতে পায় দূর থেকে ধেয়ে আসা জনতার ক্রুদ্ধ কোলাহল। একটা হিমশীতল ভয় রতনের শিরদাঁড়া বেয়ে উপর থেকে নীচে নেমে যায়। ওরা আসার আগে লুকাতে পারবে তো? অল্প একটু দৌড়ানোর পরই শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে রতনের। মনে হয় বুকের ওপর কেউ যেন বিশাল ভারী একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে।

বাঁশঝাড়ের আলো-অন্ধকারের আড়ালে থেমে একটু শ্বাস নেয় রতন। ঝিরিঝিরি বাতাসে বাঁশপাতার দোলা ওর স্বেদাক্ত শরীরে শীতল পরশ ছোঁয়ায়। বেশীক্ষণ দাঁড়ানোর সাহস করে না রতন। সারি সারি গাছের ফাঁক গলে মন্দিরের চূড়া ওর দৃষ্টির সীমানায় ভেসে ওঠে। মনে একটু বল পায়। ছোটবেলায় কেউ ওকে দৌড়ে হারাতে পারাতো না। দাঁতে দাঁত চেপে সে কথা স্মরণ করে রতন দৌড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওর খোঁজকারীদের আগেই মন্দির পর্যন্ত পৌঁছতে পারে রতন। নিজেকে লুকিয়ে ফেলে সেই ফোকড়ের মাঝে। শুনতে পায় আশে পাশেই লোকজন ঘুরছে ওর খোঁজে। এই ফোকড়টার কথা খুব কম লোকই জানে। রতন শ্বাস বন্ধ করে রাখে। মন্দিরের পাশ দিয়ে ওর খুব কাছ দিয়ে কে যেন হেঁটে যায় কিন্তু রতনের উপস্থিতি বুঝতে পারে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ওই ফোকড়ে বসেই রতন ঘুমিয়ে নেয় বেশ কিছুক্ষণ। ওর ক্লান্ত শরীর নিদ্রার বিশ্রামে জোর ফিরে পায়। রাত একটু গাঢ় হলে রতন বের হয়ে আসে। চুপিচুপি হেঁটে বাড়ির দিকে আসে। খুব খিদে পেয়েছে ওর। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে সখি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। চাপা গলায় রতন ডাক দেয় সখিকে। সখি ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে আসে জানালার কাছে।

বলে, 'পুলিশ এইসেছিল বাড়িতে। আমারে জিজ্ঞিসা কইরল তুমি কই। আমি যখুন বুললাম জানিনে আমারে একটা চড় মাইরল। আমারে থানায় নিতে চেইয়েছিল শুধু বাচ্চাগুলোরে দেইখে আর নেয় নাইনে। তুমি কি কইরছ গো? সবাই বুইলছে রমজান মইরেছে আর তার জন্য নাকি তুমি দায়ী। সত্য, সত্য তুমি রমজানরে খুন কইরেছ? গেরামের সব মানুষ তুমার উপর খেইপে আছে। তুমারে পেলেই মেরে ফেলাবে।'

রতন বলে, 'রমজান নামে কাউরে আমি চিনিনেকো। কি যে হল কিছুই বুইঝতে পাইরছি না। দরজাটা খুল বউ ইকটু ঘরে ঢুকি।'

সখি দরজা খুলে দিতে রতন ভেতরে ঢুকে এল, 'কিছু খেতে দেরে বউ। খিদেয় পেটের ভেতরটা জ্বইলে যাইচ্ছে।'

সখি ধামায় করে মুড়ি আর বাতাসা এনে দেয়। ক্ষিদের পেটে তাই অমৃতের মতো লাগে রতনের। রতন টের পায় এই উত্তেজনায় ওর শরীর থেকে অসুস্থতা কোথায় জানি পালিয়ে গেছে!

খাওয়া শেষ করে রতন বলল, 'শোন বউ আমারে কিছুদিন ইকটু গা ঢাকা দিতে হবে। তুই ইদিকটা দিখিস।'

একটা গামছায় কিছু মুড়ি-বাতাসা-চিঁড়ের মোয়া বেঁধে নিল রতন। তারপর বাক্স খুলে বউয়ের গয়না গুলো নিল। সখি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কোনো বাধা দিল না। বরং গলার চেন আর কানের দুলটাও খুলে রতনের হাতে তুলে দিল।

বলল, 'তুমি চলে যাউ। গেরামের লোক টের পাওয়ার আগেই পালাউ।'

রতন অবাক তাকিয়ে রইল সখির মুখের দিকে। কোনো কথা জোগালো না ওর মুখে। এত ভালো হয় কি করে মানুষ! সখির গালটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে অন্ধকারে মিশে গেল রতন।

আকাশে চাঁদ ছিল না। এত রাতে কেউ নেই বাইরে। তারার আলোয় চেনা পথ ধরে রতন নদী পর্যন্ত হেঁটে এল। ঘাটে বাঁধা নৌকাটা খুলে নিজেই বেয়ে নদী পার হল। তারপর বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। কোথায় যাবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না। ভয়ে, চিন্তায় ওর সারা শরীর ঘেমে নেয়ে উঠছিল। বেশ কিছুটা পথ যাবার পর রতন দেখল রাস্তার পাশে একটা পাঁচ টনী ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের আলোয় দু'জন লোক ট্রাকটার চাকা বদলানোর চেষ্টা করছে।

রতন বলে, 'কি ভাই হাত লাইগবে নাকি?'

'হাত লাগালে তো খুবই ভালো হয়। ইকটু তাড়া আছে আমার।'

রতন সাহায্য করল ওদের। স্পেয়ার চাকাটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে এল ট্রাকের পেছন থেকে।

'তা যাইচ্ছ কুথায় তুমরা?' কাজ করতে করতে জিজ্ঞেস করে রতন।

স্প্যানার দিয়ে নাটটা ঘোরাতে ঘোরাতে একজন বলে, 'মাল নিয়ে ওপার যাইচ্ছি। ভোরের মইধ্যে বর্ডার পৌঁছতে না পারলে পরে এত ভিড় হইয়ে যায়। বর্ডারে বইসে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা।'

বর্ডার। ওপার। এই শব্দগুলো রতনের মনে নতুন পথ খুলে দেয়। এইতো উপায়। কিছুদিন ওপারে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেই তো হয়।

চাকা বদলানো হয়ে গেলে রতন বলে, 'ভাইটি আমারে তুমাদের সাতে নিবে নাকি? আমারও উদিক পানে যাবার কথা কিন্তু বাস ফেল কইরেছি। তুমরা যদি সাতে নাও তা হইলে আমার আর বাড়ি ফিরে যেতে হবে নানে।'

ড্রাইভার ভালো করে রতনকে জরিপ করে। অসুখের পর রতন বেশ কাহিল হয়ে গেছে। ওকে দেখে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। ওকে তুলে নিল ওরা। হেল্পারের সাথে ঘষাঘষি করে পাশের সিটে বসল রতন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল ওর। ট্রাক চলতে শুরু করলে দুলুনী আর হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ল রতন। ঘুম ভাঙল একবারে বর্ডারের কাছে এসে। বেশীদূর নয় বর্ডার। ঘন্টা তিনেকের পথ। বেনাপোলে বাস স্ট্যান্ডের কাছে নেমে গেল রতন আর ট্রাকটা চলে গেল সীমানার দিকে ওপারের উদ্দেশ্যে।

রাতের বাসগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে শুরু করল। পশ্চিম বঙ্গে যাবার যাত্রীরা ভিড় জমাতে থাকলো রিক্সাগুলোর আশেপাশে। বাসস্ট্যান্ড থেকে সীমান্তের ইমিগ্রেশন অফিস পর্যন্ত যেতে রিক্সা নিতে হয়। আশেপাশের দোকানপাট গুলোও খুলতে শুরু করল। রতন একটা চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা আর দু' পিস পাঁউরুটি খেতে খেতে ভাবতে শুরু করল এখন কি করা যায়। বাপ বেঁচে থাকতে বছর চারেক আগে বাপের সাথে একবার ওপারে গিয়েছিল রতন। ওদের গ্রামের ছেলে স্বপন তালুকদার। বাপের সাথে চেনা জানা ছিল বেশ। এপার ওপার মানুষ আনা-নেওয়ার দালালী করতো। কখনো থাকতো এপারে, কখনো ওপারে। এপারে থাকলে মাঝে মাঝে গ্রামে এসে বাপের সাথে দেখা করে যেত। ওদের বাড়িতেও থেকেছে দুয়েক রাত। সেই স্বপন একবার রতন আর বাপকে নিয়ে গিয়েছিল ওপার বাংলায়। কোনো কাগজপত্র ছিল না ওদের। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে স্বপন চেনা পথে নিয়ে গিয়েছিল। বাপের কাশিটা কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। স্বপন বলেছিল ওপারে নাকি এক ডাক্তার আছে। সাক্ষাৎ ধণ্বন্তরী। তার কাছ থেকে ওষুধ নিলে সব রোগ ভালো হয়ে যায়। বর্ডার থেকে অটোতে করে বনগাঁ ট্রেন স্টেশন। সেখান থেকে ঘন্টাখানেক ট্রেনে করে বিরাটী। সেখানেই ডাক্তার বসেন। তিন দিন ছিল ওরা। ডাক্তার দেখলেন বাপকে। ওষুধ দিলেন। ওষুধপত্র কিনে ওরা আবার একই পথে ফিরে এল এপারে। কথাটা মনে পড়ে হাসি আসলো রতনের। এক্কেবারে ভূয়ো সেই ডাক্তার। বাপের কাশিতো কমেই নি বরং ওই ওষুধ খেয়ে যেন মনে হয় বেড়ে গিয়েছিল।

রতন ভাবতে থাকলো যে করেই হোক স্বপনকে ওর খুঁজে বের করতে হবে।

চায়ের দোকানের মালিককে হাতছানি দিয়ে ডাকলো রতন, 'মিষ্টি আছে নাকি ভাইটি? খুব মিষ্টি খেতে ইচ্ছে কইরছে।'

মালিক একগাল হেসে ফেলল, 'কত মিষ্টি খাবা তুমি? কাইল রাইতে বানাইছি। সারা রাত ধইরে সিরার জালায় ডুইবে এখন একদম অমৃত হয়ে আছে।'

রতন দু'টো মিষ্টির অর্ডার দেয়, 'বসো না ভাই, একটু গপসপ করি। তা তুমার নামটা কি?'

দোকানে বেশী লোক ছিল না। যে একজন কর্মচারী আছে সেই সামাল দিতে পারছিল।

'নাম সুনীত ময়রা। তা বল কি বুলবা।'

সুনীতের সাথে গল্প জুড়ে দেয় রতন। সংসারের হাল-হকিকত, ব্যবসা কেমন চলছে, বর্ডারের অবস্থা কি এ সব নিয়ে টুকরো টুকরো কথা। বেশ খানিকক্ষণ কথা বলার পর রতন বোঝে সুনীতের বিশ্বাসের গন্ডীতে ও ঢুকে পড়েছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, 'স্বপন তালুকদাররে চিনো ভাই?'

সুনীত সাথে সাথে জবাব দেয় না। রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর বলে, 'চিনি। তা তারে দিয়ে তুমার কাজ কি?'

'আমার গেরামের ছেইলে। বাপের খুব কাছের লোক। বাপ বুইলছে তার সাতে দেখা করতে। তবে আমি জানিনে তার বাড়ি কুথায়।'

'স্বপনের সাতে আমি তুমার দ্যাখা করাইয়ে দিতে পারি। তবে আমারে কিছু দিতে হবে তার জন্যি।'

'আগে আমারে নিয়ে চল তুমারে আমি খুশী কইরে দিব।'

এত সহজে স্বপন তালুকদারের খোঁজ পাবে রতন ভাবতেও পারে নি।

সুনীত চিৎকার করে বলে, 'ওই হারা দুকানটা একটু সামাল দেতো, আমি ইকটু বাইর থিকে আইসছি।'

রতনকে নিয়ে সুনীত রিক্সায় এসে ওঠে। সীমান্তে টাকা বদলানোর বেশ কিছু দোকান আছে। তারই একটার ভেতর স্বপনকে বসে থাকতে দেখা যায়। রতনের ভেতরটা আশায় ভরে ওঠে।

রতনকে দেখে স্বপন চিনতে পারে, 'আরে রতন মিয়া না? ইখানে তুমি? কি মনে কইরে? একি চেহারা হয়েছে তুমার?'

সুনীতের হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বিদায় করে দেয় রতন। স্বপনকে নিয়ে বাইরে গাছের নীচে একটা বেঞ্চিতে এসে বসে। এই ব্যবসাটা স্বপন শুরু করেছে কিছুদিন হল। মানুষ পাচার করতে করতে টাকাপয়সা ভালোই জমেছিল ওর। এখন এক মারোয়াড়ীর সাথে নেমেছে এই ব্যবসাতে। তবে রাতের অন্ধকারের গোপন ব্যবসাটাও একই সাথে চালিয়ে যাচ্ছে।

রতন বলল, 'কি হয়েছে জানো, গেরামে তুমুল গন্ডগোল লেগেছে। জমিজমা নিয়ে মারামারি। ইর মইধ্যে একলোক খুন হইয়ে গেছে। আর কে জানি আমারে ফাসায়া দিয়েছে। পুলিশ হন্যি হইয়ে খুইজছে আমারে। আমি জানটা নিয়ে কোনোরকম পলায়ে এইসেছি। স্বপনদাগো আমার ইকটা বেবস্থা কইরে দাউ।'

স্বপন বলে, 'ট্যাকাপয়সা কিছু আনতে পেরেছ?'

'ট্যাকা নাই কিন্তু বউয়ের কিছু গহনা আছে। তা দিয়ে মনে হয় হয়ে যাবেনে।'

দোকানের একটা ছোট ছেলের সাথে রিক্সা করে স্বপন ওর বাড়ি রতনকে পাঠিয়ে দেয়। বাস স্ট্যান্ড থেকে বেশী দূরে নয়। অনেক লোক বাড়িতে। স্বপনের পরিবার, মা বাবা। বাইরের একটা ঘরে বসতে দেয় রতনকে। কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে রতন।

দুপুরবেলা স্বপন ভাত খেতে আসে বাড়িতে। বর্ডারে ভিড়টা হয় সকালেই। দুপুরের পর থেকে লোকের আনাগোনা পাতলা হয়ে আসে। মাটিতে চাটাইয়ের ওপর বসে লাবড়া, ডাল আর তপসে মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেতে খেতে স্বপন রতনকে বলে, 'তুমারে আমি ওপার পাঠায়ে দিতে পারি। তিন দিন পর একটা দল যাবে তাদের সাতে। তবে ওপার গিয়ে তুমি কি করবা কিছু ভাইবেছ? কুনো চেনাজানা আছে তুমার?'

রতন বলে, 'সেই কথাটাতো আমিও সারাদিন ধরি ভাইবছি। আমিতো কাউকেই চিনিনানে। কি করা যায় বলতো দেখিনি।'

স্বপন বলে, 'দাড়াউ ভেবে দেখি।'

স্বপন আবার দোকানে চলে যায়। একা একা ঘরে বসে রতনের কিছুই ভালো লাগে না। গত চব্বিশ ঘন্টায় কতকিছু ঘটে গেছে! ভাবলে এখনো বিশ্বাস হতে চায় না রতনের। সব কিছু বড় দূরের লাগে। মিস মালার মুখটা, কাঞ্চির সোহাগী হাসিটা ঝাপসা মনে পড়ে। মন জুড়ে বড় হয়ে থাকে সখির শেষ দৃষ্টিটা। একটা কথাও বলে নি সখি রতন চলে আসার সময়। শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। বোবা পশুর মতো চাহনি। ভীষণ অসহায়, ভীষণ ব্যথায় ভরা সে চাহনি। অনেকদিন পর বিয়ে-করা বউয়ের জন্য রতনের মনটা কেমন যেন টানে।

রাতে খাওয়ার পর দাওয়ায় বসে স্বপন বলে, 'শোন রতন মিয়া, আমার সাতে কাজ কইরবা নাকি? বিশ্বাসী লোকের বড় অভাবে আছি। রাত্তিরের কাজটা ঠিকমত কইরে উঠতে পাইরছি না। কত হাজার হাজার লোক যাওয়া আসা কইরতে চায়। আমি একা আর কতদিক সামাল দিতে পারি। তুমি আমার সাতে যোগ দাউ। মাসে আট-দশ দিন কিছু লোকরে ইপার-ওপার কইরবা। চিন্তার কুনো কিছু নাই। চিনা রাস্তা। যিখানে যিখানে ট্যাকা দেওয়ার দরকার সবখানে নিয়মিত ট্যাকা দিয়ে আইসছি। আর তুমি তো আমার সাতে এর আগে গিয়ে দেইখেছ। ভালো রুজগার। আরামে থাকবা।'

রতনের না বলার কিছু ছিল না। এত সহজে যে ওর জীবন চালানোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে তা কি ও ভাবতে পেরেছিল? স্বপনের সাথে তো ও গিয়েছে ওপারে। খুবই সহজ। কেউ কিছু বলে না। শুধু জরুরী হচ্ছে পথটা ঠিকমত চিনে যাওয়া। পথ বেভুল হলেই সর্বনাশ। বিডিআর আর বিএসএফ বসে আছে রাইফেল বাগিয়ে। রতন রাজী হয়ে যায় স্বপনের প্রস্তাবে।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-৬

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একা ভাবে সখি। রাত অনেক গভীর হয়েছে। কিন্তু ওর চোখে ঘুম আসছে না। পাশে কি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে ছেলে-মেয়েগুলো। পাঁচ, তিন আর এক বছর বয়স ওদের। সখিকে খুব কষ্ট দিয়ে ওরা পৃথিবীতে এসেছে। প্রতিবার ওরা পেটে আসার পর বিবিধ সমস্যা জর্জরিত করতো সখিকে। পা ফুলে যেত, শ্বাস নিতে পারতো না। প্রথম বাচ্চাটা হবার সময় বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তার পরের দু'টো হয়েছে এ বাড়িতেই। শেষ সন্তানটা পেটে আসার পর মাঝে মাঝেই খিচুনি হতো সখির। শ্বশুর-শাশুড়ি দু'জনেই মারা গেছেন ততদিনে। আর রতনের তো কোনো খোঁজই মিলতো না। রাত ঘনিয়ে দুপুর হলে তারপর বাড়ি ফিরতো। সখির দিকে তাকানোর কেউ ছিল না। বাচ্চাটা হয়ে গিয়েছিল সপ্তাহ দুয়েক আগে আর সখির শরীর থেকে এত রক্ত ঝরেছিল যে বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না। তাও ভাগ্যি রতন একটা দাই ঠিক করে দিয়েছিল। সে দাই বাচ্চা আর সখির যত্ন করতো। প্রায় মাস দু'য়েক লেগেছিল সখির বিছানা থেকে উঠে চলেফিরে বেড়াতে। তবে শরীরটা একদম ভেঙে গিয়েছিল। হাড়-মাংস সব মিশে গিয়েছিল চামড়ার সাথে।

চারদিন হল রতন চলে গেছে। এখন কি করবে সখি? কে সামলাবে ঘর-দোর-জমি-জিরেত? জয়নাল আর শহীদ আছে কিন্তু বাড়ির মালিক না থাকলে শুধু ওদের উপর নির্ভর করে কি থাকতে পারবে সখি? এই যে রতন ওর স্বামী, তার কি একটুও দায়িত্ব নেই? নিজেকে বাঁচাতে গা ঢাকা দিল কিন্তু বউ-বাচ্চাদের কি হবে তা কি একটুও ভাবলো না? সখি ভাবে রতন কি কোনোদিন ওকে একটুও ভালোবাসে নি? ছ' বছরের বিবাহিত জীবন ওর। বিয়ের পর ওর শরীরটা ছানার জন্য পাগলের মতো করতো রতন। সখিরও খুব ভালো লাগত। রতনের সব পাগলামিকে শরীরে ঠাঁই দিত। তখন মনে হতো এইতো ভালোবাসা। প্রথম গর্ভধারণের পর থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল রতন তারপর তো হারিয়েই গেল একেবারে। গত এক বছরে ঠিকমতো কথাও বলেনি রতন সখির সাথে। সখির শরীরটাকেই শুধু দরকার ছিল রতনের? ভালোবেসে কত কিছু রান্না করেছে, অসুখে পরলে জান দিয়ে রতনের সেবা করেছে সে সবের কি কোনো মূল্যই নেই? সখি ঠিক করলো এ বাড়িতে আর থাকবে না ও। যেখানে ওর, ওর সন্তানদের কোনো মূল্য নেই সেখানে থাকার কোনো মানে নেই। ভালোই হয়েছে রতন চলে গিয়ে। ওর চলে যাবার পথটা তৈরী করে দিয়ে গেছে।

বাপের বাড়ি চলে এল সখি। বর্ধিষ্ণু পরিবার ওদের। বাপের জমিজমা আছে। ভাই কলেজে মাষ্টারী করে। খাওয়া-পড়ার কোনো অভাব নেই সখি আর ওর ছেলেমেয়েদের। শুধু একটা কথাই ভাবে সখি রতন যদি কোনোদিন ফিরে আসে তাহলে জিজ্ঞেস করবে রতনের জীবনে ওদের কোনো মূল্য আছে কিনা। ওদেরকে রতনের প্রয়োজন আছে কিনা।

বিছানায় শুয়ে রতনেরও ঘুম আসছিল না। তিনটি বছর পার হয়েছে এর মাঝে। স্বপন তালুকদারের পরামর্শে ওর সাথেই কাজ নিয়েছে রতন। দু' কামরার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। স্বপনের দোকানের এক কর্মচারীর সাথে ভাগাভাগি করে থাকে।

স্বপন বলেছে, 'শোনো রতন, তুমি ফেরারী আসামী। পুলিশ তুমারে খুইজছে। কাজেই ইকটু গা ঢাকা দিয়ে থাকো। বাড়ি থেকে বাহির হইয়ো না। একটা হোটেলের সাথে মাস চুক্তি কর তারা তুমার

তিনবেলার খাবার ঘরে পৌছে দিবে। যখুন আমি তুমারে ডাক দিব তখুন তুমি আইসবা। বাকীটা সময় ঘাপটি মাইরে থাকবা।'

রতন বোঝে এ ছাড়া ওর আর কোনো উপায় নেই। সারাদিন বাড়িতে বসে বিছানায় শুয়ে ওর শরীরটা বেশ তরতাজা হয়ে উঠছিল।

স্বপন আরো বলেছিল, 'রাত্তির বেলা তুমার যা কাজ তাতে পুরো সজাগ হইয়ে থাইকতে হবে। যদিও চেনা রাস্তা তবুও নজর রাইখতে হবে কুথাও কুনো বেভুল হল কিনা। কানটা খাড়া রাইখতে হবে কুনো অন্যরকম শব্দ শোনা যায় কিনা। যদি দূরে গুলির শব্দ শুনো কোনো চেচামেচি শুনো সাতে সাতে গা ঢাকা দিতে হবে। কোনো রিস্ক নিবা না। আর সজাগ থাকতে হইলে কি কইরতে হবে জানো? নেশা করতে পারবা না। কোনো রকম নেশাই না। যেদিন কাজ থাকবে না সেদিন একটু আধটু করতে পারো কিন্তু কাজের দিন একদম না।'

মাসে প্রায় দিন দশেক কাজ থাকে। আর যে রাত্রে কাজ থাকে তার পরদিন শরীর এত ক্লান্ত থাকে যে সারাদিন পরে পরে ঘুমায়। নেশা না করতে করতে রতনের মাথাটা ধীরে ধীরে পরিস্কার হতে থাকে। জীবনের যে ক'টা দিন পার করে এসেছে তা মনের পর্দায় ভেসে উঠে ওকে আনমনা করে দেয়। কি পাগলামীটাই না করেছে মিস মালাকে নিয়ে। আচ্ছা মিস মালা কি সত্যিই পরীর মতো সুন্দর নাকি ওর নেশার কল্পনা? কাঞ্চির কথা মনে পড়ে রতনের। কি সুন্দর হাসি ছিল মেয়েটার। এখনতো রতন নেই। কে কাঞ্চির বিছানায় আছে? এ সব কথা ভাসিয়ে রতনের খুব মনে পড়ে সখির কথা। জ্বরের সময় সখির সেবার কথা। শেষবার চলে আসার সময় গায়ের গয়না খুলে দেবার কথা। চোখে জল চলে আসে রতনের। সখিকে কোনোদিন তো ভালো মুখে একটা কথাও বলে নি।

স্বপন এসে ডাক দেয় রতনকে, 'রতন মিয়া আইজ রাত্তিরে যেতে হবেনে। দশটা নাগাদ রেডী থেইকো। আমি পার্টি নিয়ে আইসবোনে।'

প্রথম দিকে স্বপন যেত রতনের সাথে। এখন রতন নিজেই পথঘাট সব চিনে গেছে। দশটা নাগাদ মাইল দুয়েক দূরে একটা জামরুল গাছের নীচে রতন অপেক্ষা করতে থাকে স্বপনের। এই চুরি চুরি খেলাটা খুব মজা লাগে রতনের। গ্রামে প্রতি বছর একটা বনভোজন করতো ওরা। নিয়ম ছিল সবাই কিছু না কিছু চুরি করে আনবে আর সেই চুরির সামগ্রী দিয়ে নদীর পারে রান্না করে খাওয়া হবে। খিচুড়িভাত আর কুকড়োর ঝোল। কেউ তার সাথে আনে আচার। মিষ্টি। তের থেকে উনিশ বছরের গোটা পনের জনের দল। সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে কুকড়ো চুরি করা। মুরগী পোষে এরকম বাড়ি বেশী নেই। তার ওপর কোনো শব্দ না করে মুরগীর গলাটা চেপে ধরে বাড়ি থেকে বের করে আনাটা খুবই কঠিন কাজ। প্রতিবার এই দায়িত্বটা পড়তো রতনের। নিঃশব্দে শ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারে মিশে যেত রতন। তারপর সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে মুরগীর গলাটা চেপে ধরে তুলে আনতো খাঁচার ভেতর থেকে। বাড়ির লোক তো নয়ই একই খাঁচায় অন্য যে মুরগীগুলো থাকতো তারাও টের পেত না। অন্ধকারে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রতনের মনে হয় সেই অভিজ্ঞতাগুলো আজকে ওর খুব কাজে লাগছে।

স্বপন হাজির হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই। স্বামী-স্ত্রী আর বছর তিনেকের একটা ছেলে। বউটার সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদূর। রতন কখনো পরিচয় জিজ্ঞেস করে না। স্বপনই বলে ভোলা থেকে এসেছে ওরা। ছোট একটা ধানী জমি ছিল। গ্রামের নতুন চেয়ারম্যান সেই জমি দখল করে ওদের বলেছে, 'ভাগ তুরা। তুদের ইন্ডিয়া আছ হেথায় চইলা যা।'

বউটার দিকেও নাকি কুদৃষ্টি দিচ্ছিল চেয়ারম্যানের উঠতি ছেলে। ওরা আর দেরী করে নি সেরাতেই পালিয়ে এসেছে। ওদের গ্রামের এক লোক স্বপনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা তখনো জেগে ছিল।

স্বপন রতন আর লোকটাকে ডেকে বলল, 'উ জাইগে থাকলে মুশকিল হইয়ে যেতে পারে। যদি হঠাৎ কেঁদে উঠে সারা পিরথিবী জাইনে যাবে। ইটা দু'ঢোক খাইয়ে দাও। মিষ্টি মিষ্টি আছে না কইরবে নানে।'

পকেট থেকে পিরিটনের একটা বোতল বের করে স্বপন। মা আদর করে করে প্রায় অর্ধেক বোতল খাইয়ে দেয় বাচ্চাটাকে। ওরা অপেক্ষা করে বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত।

তারপর স্বপন বলে, 'যাউ রতন মিয়া আগিয়ে যাউ। আমি চলি এখুন।'

বাচ্চাটাকে চাদর দিয়ে ভালো করে বুকের সাথে বেঁধে নেয় বাবা। তারপর রতনের পিছু পিছু পথ চলে ওরা। মাইল চারেক পথ হেঁটে পার হতে হবে। বেশীক্ষণ লাগার কথা না। মূল কথা সাবধানে কোনো শব্দ না করে পথ চলা। যেখানে গাছ আছে সেখানে গাছের ছায়ায় হেঁটে হেঁটে পার হওয়া যায়। একটা জায়গা আছে যেখানে আশেপাশে কিছু নেই। খোলা প্রান্তর। সে জায়গাটা বুক মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে পথ চলতে হয়। দু'দিন আগে বৃষ্টি হয়েছে। মাটি নরম হয়ে আছে। কোথাও কোথাও গোড়ালি অব্দি গভীর কাদা। আজকে আকাশে চাঁদ নেই। তাই রতন একটু গা ছাড়া দিয়ে হাঁটছে। কারো ওদেরকে দেখতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। স্বপনের সাথে বেশ কয়েকবার যাওয়া-আসার পর পথটা মুখস্থ হয়ে গেছে রতনের। আলো না থাকলেও কোনো কষ্ট হয় না পথ চলতে। সীমান্তের খুব কাছে চলে এসেছিল ওরা। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো ছোট ছোট জংলা গাছের ঝোপ এখানে। তার একটা জায়গায় ছোট একটা ফাঁক করে রাখা আছে। তা গলে পার হতে হবে। এই ফাঁকটার স্থান মনে রাখাই সবচেয়ে জরুরী। রতন টের পায় ও একটু বেশী পশ্চিমে চলে এসেছে। উল্টোদিকে কিছুদূর এগুতেই খুঁজে পেল ফাঁকটা। সারি বেঁধে পথ চলল ওরা। প্রথমে রতন । তারপর পেছনে শিশুটিকে কোলে নিয়ে লোকটা। পিরিটনের প্রকোপে ঘুমে কাদা হয়ে আছে বাচ্চাটা। সবশেষে বউ। শাড়ির আঁচল গাছের কাঁটায় আটকে গিয়েছিল বউয়ের। টান দিতে এক টুকরো ছিঁড়ে গাছে জড়িয়ে রইল। এ জায়গাটুকু পার হলে আর অল্প একটু পথ। একটা বটগাছের নীচে অপেক্ষা করছিল সঞ্জীব পোদ্দার। বাকী দায়িত্বটুকু তার। পরিবারটাকে সঞ্জীবের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে শ্বাস ফেলল রতন। তারপর একাকী আবার উল্টো পথে ফিরে এল।

ভোর প্রায় হয়ে এসেছে। এ সময়গুলোয় ওর সারা শরীর কাউকে চায়। গত তিনবছর ধরে উপোসী আছে ও। স্বপনের কড়া নিষেধ কোনো মেয়েকে ঘরে আনবে না।

বলেছে, 'মনে রাইখবা, যত নষ্টের গোড়া হইছে ওই মেয়েমানুষ। যদি বাঁইচতে চাউ কখনো ঘরে মেয়েমানুষ আনবা না। তাদের পিছু পিছু একশটা বিপদ তুমার ঘরে আইসে পরবে।'

রতন শুনেছে এখানে নাকি ছোট একটা পতিতাপল্লী আছে। তবে তার বেশীরভাগ খদ্দেরই বিডিআর। জেনেশুনে সেখানে গিয়ে ধরা পড়তে চায় না রতন। আজকে বউটাকে দেখে রতনের ভেতরে অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। বেশ লাজুক মিষ্টি চেহারা। সখির চেহারাটা যেন অনেকটা এ রকম। সখির জন্য আবারো মন কেমন করে উঠল রতনের।

পরপর বেশ কয়েকদিন কোনো খবর এলো না স্বপনের কাছ থেকে। কি হল বুঝতে পারে না রতন। ব্যবসাপাতি কি মন্দা চলছে নাকি স্বপনের?

দিন দশেক বাদে স্বপন এসে হাজির হল এক সন্ধ্যায়।

বলল, 'বিডিআর-এ এক নতুন মেজর এইসেছে। খুব টাইট দিচ্ছে ইদিকে। তাই এ কদিন ঘাপটি মেরে ছিলাম। তবে শুনলাম এখন আবার সব ঠিকঠাক। আইজকে একটা পার্টি নিয়ে যাউ রতন মিয়া। খুব সিম্পল কেস। দুজন লোক। চিন্তার কিছু নেইকো।'

রতন বেড়িয়ে পড়ল ওদেরকে নিয়ে। চেনা পথ পার হয়ে জংলা ঝোপ অব্দি পৌঁছল কিন্তু ফুটোটা আর খুঁজে পেল না। পথ ভুল করল নাকি? কিন্তু তা কি করে হয়? ভালো করে এদিক ওদিক খোঁজাখুজি

করতেই হঠাৎ জ্বলে উঠল সার্চলাইট। আর্তস্বরে দিগন্ত কাঁপিয়ে বেজে উঠল এলার্ম। অবাক বিস্ময়ে রতন দেখল ওদেরকে ঘিরে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিডিআর-এর জওয়ানেরা।

একজন অফিসার হাসতে হাসতে রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এতদিনে ধরা পড়েছে পাখি। তা পাখি উড়াল দিয়েছ ভালো কথা কিন্তু পালক ফেলে এসেছ কেন?'

রতন প্রথমে বুঝতে পারে না কি বলতে চাইছে অফিসার তারপর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে আগের বার পার করে দেয়া বউয়ের শাড়ির টুকরো। রতন জানে সীমান্ত এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন করে বিডিআর, বিএসএফ দু'পক্ষই। ঝোপে আটকে পড়া শাড়ির টুকরো দেখে ওরা খুঁজে পেয়েছে কোন পথ দিয়ে পাচার হয় মানুষ। রতন ভাবে কিন্তু স্বপনের তো সব খানে টাকা দিয়ে রাখার কথা। এই পথটার খবর তো অনেকেরই জানার কথা তাহলে আগে কেন ধরা পড়ে নি? এই অফিসারই কি নতুন মেজর?

বিডিআর-এর ট্রাকে করে রতনকে নিয়ে আসা হল থানা হাজতে।

নাম-ঠিকানা বলতেই ওসি লাফিয়ে উঠল, 'আরে এ তো খুনের ফেরারী আসামী! তা চান্দু তুমি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লা আমার হাতে।'

রতন বুঝল ওর দৌড় শেষ। আর কোনো দিকে যাবার কোনো পথ নেই ওর। মারধোর করার আগেই ও বলে দিল যেটুকু ও জানে। স্বপন তালুকদারের নাম। সঞ্জীব পোদ্দারের কথা। পরদিনই ওরা ওকে চালান করে দিল ওদের শহরের হাজতে। ওসি সুখ মিটিয়ে পেটাল রতনকে।

বারবার জিজ্ঞেস করল, 'বল কে মেরেছে রমজানকে?'

রতন বলল, 'আমি জানি না। রমজানরে আমি চিনিনা। যখন লাঠালাঠি হয় তখন আমি জ্বরের ঘোরে বিছানায় পইরে আছি।'

কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না ওর কথা। পাছায় ছালা বেঁধে বেদম প্রহার করা হল ওকে।

'বল কেন তুই একই জমি দুই জনকে বেচিছিস?'

রতন বলে, 'আমি জমি বেচি নেইকো। আতর আলীর কাছে টাকা ধার নিয়েছিলাম তার বদলে সে একটা কাগজে আমার সই নিয়েছিল। আর শফিক মিয়ার কাছ থেকে দলিল বন্ধক দিয়ে দশ হাজার টাকা নিয়েছিলাম।'

কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না রতনের কথা।

জেলে রতনকে দেখতে আসে রবি মোক্তার, 'সত্যি কইরে বলতো কি ঘটেছে রতন মিয়া?'

রবি মোক্তারকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে রতন। এই প্রথম কাউকে পেল যাকে নিজের পক্ষের মনে হল। সব ঘটনা খুলে বলল রতন।

রবি মোক্তার বললেন, 'শোনো রতন, আমি তুমার বড় ভাই রাশেদের পক্ষে ওকালতি কইরছি। বেচারা সাতেপাচে নাই শুধু তুমার কারণে অনর্থক হয়রানি হইচ্ছে। আমি তুমার জন্যিও ওকালতি কইরতে পারি তবে তুমারে আদালতে দাঁড়ায়ে সত্যি কথা সব বুইলতে হবে। রাশেদ মিয়ারে মুক্তি করার চাবি তুমার হাতে।'

রতন মেনে নিল।

তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সখিরে কি একবার দেখা যায়? আপনি কি ওরে একবার আমার কাছে নিয়ে আইসতে পারবেন?'

রবি মোক্তার মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'মনে হয় না আইসবে। আমি বুইলে দেখবো নে।'

এক সন্ধ্যায় রবি মোক্তারের সাথে সখি আসে রতনের সাথে দেখা করতে। তিন বছরে বাপের বাড়ির আশ্রয়ে সখির শরীরটা আবার ঠিক হয়ে এসেছে। রতন অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে এ যেন ওর বিয়ে করা প্রথম বউ।

রতন বলে, 'কেমুন আছিস বউ? কেমুন আছে বাচ্চারা?'

সখি কঠিন মুখে বলে, 'আমরা ভালোই আছি। তুমারে কি খুব মাইরছে এরা?'

রতন ম্লান হাসে, 'তা ইকটু আধটু তো মাইরছেই।'

সখির মনে অসংখ্য অভিমান অসংখ্য অভিযোগ ফেনিল হয়ে কথা বলতে চায় কিন্তু রতনের অবস্থা দেখে কিছু বলতে পারে না।

রতন বলে, 'আমারে তুই মাপ কইরে দিস রে বউ। আমার জন্যি কত মানুষ কষ্ট পাইল । আমি তো তুর জন্যি কোনোদিন কিছু করিনিনে।'

সখির চোখদুটো জ্বালা করে ওঠে।

বলে, 'আমার জন্যি কিছু কইরতে হবে না নে। তবে ভাইজানরে বাচানো তুমার দায়। তার মুখটার দিকে তাকাইয়ে তুমি সত্যি কথাটা আদালতে বুইল।'

রতন মাথা নাড়ে। সখি আর দাঁড়ায় না। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

রতনের সাথে দেখা করতে আসে আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়ার উকিলেরা।

বলে, 'রতন মিয়া যা হবার তো হয়েই গেছে। জন্ম থেকে তুমি আতর আলীকে চেন। গ্রামের সবার সাথে একসাথে বেড়ে উঠেছ। তোমাদের তো একে অন্যের দেখভাল করে রাখতে হবে। আজকে তোমার কথায় যদি ওদের শাস্তি হয়ে যায় সেটা কি ভালো হবে? শাস্তি শেষ করে এই মানুষগুলো যখন ফিরে আসবে তখন তো ওদের সাথেই গ্রামে থাকতে হবে তোমাকে। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ করে কি বেঁচে থাকা যায়? রাশেদ মিয়া তো তোমার আপনভাইও নয়। তোমার জন্মের আগেই সে গ্রাম ছেড়েছে। তুমি তো তাকে ঠিকমত চেনই না। তার কি হল না হল তাতে তোমার কি আসে যায়? আদালতে দাঁড়িয়ে তুমি বল এই খুনের জন্য রাশেদ মিয়া দায়ী। আমাদের মক্কেলদের বাঁচিয়ে দাও। তোমার জমি তো তুমি ফেরত পাবেই তার সাথে পাঁচ লাখ টাকা পাবে। তোমার পরিবারকেও আমরা দেখভাল করে রাখব। কি বল তুমি?'

রতন চুপ করে শোনে। তারপর বলে, 'যুক্তি আছে আপনাদের কথায়। দেখি কি করা যায়।'

'দেখি না তোমাকে কথা দিতে হবে।'

'ঠিক আছে বুলবো নে আদালতে দাঁড়িয়ে যা আপনারা বুলছেন।'

আদালতে দেখা হল রতনের সাথে রাশেদের। অনেকদিন পর রতনকে দেখল রাশেদ। রতনের চোখ দু'টো ফোলা ফোলা। শরীরে মেদ জমে বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা ছাপিয়ে মুখের করুণ অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠছে নির্যাতনের নিদর্শন। ওর চেয়ে কত ছোট রতন! রতন হওয়ার আগেই গ্রাম ছেড়েছে রাশেদ। রতনকে কোনোদিন ঠিকমত চেনা হয়ে ওঠে নি রাশেদের। রতন দেখে রাশেদকে। কি অবস্থা হয়েছে ভাইজানের! সে প্রাণময় হাসিভরা ঋজু রাশেদ যেন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। মাথার সব চুল পেকে গেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা সাদাপাকা দাড়ি। ঘাড়টা নুয়ে যেন বুকের ভেতর ঢুকে গেছে। চোখ দু'টো মাছের চোখের মতো নিস্প্রভ। কোনো আলো নেই তাতে। রাশেদ যেন বুঝে গেছে ওর সামনের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনোদিকে ওর যাবার পথ নেই। নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ও। রতন ভাবে ওর জন্যই বড় ভাইয়ের এ অবস্থা! সখি আর রবি মোক্তারের অনুরোধ মনে পড়ে ওর। মনে পড়ে উকিলদের প্রলোভন। কি করবে ও? মনগড়া কাহিনী বলে রাশেদকে জেলে ঠেলে দেবে নাকি সত্যি কথা বলে সারা জীবনের জন্য শত্রু বানিয়ে ফেলবে আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়াকে? এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করতে পারবে ও? রতনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ক্রমাগত আন্দোলিত হতে থাকে। সবশেষে রতনের মস্তিষ্কে যে ক্ষীণ পরিমাণ সুস্থ মানুষ তখনো বেঁচেছিল জয় হল তার। রতনের চোখে জল এল না কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে কোনো মিথ্যে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইল না। আমিন মাতব্বর, আতর আলী আর শফিক মিয়াকে হতবাক করে রতন আদালতে দাঁড়িয়ে বয়ান করল ঘটনাপ্রবাহ, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য-ভরা ওর জীবনকাহিনী।

রতনের জবানবন্দী, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে সবশেষে রায়ের দিন এল। রমজান আলীকে খুনের অপরাধে আমিন মাতব্বর আর আতর আলীর পনের বছরের জেল হল। তাদের দলের অন্যান্যদের হল তিন থেকে পাঁচ বছরের বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি। দাঙ্গাবাজী আর প্রতারণা করে জমি দখলের অপরাধে শফিক মিয়ার সাজা হল পাঁচ বছর। যদিও রতন আমিন মাতব্বর আর শফিক মিয়ার প্রতারণার স্বীকার কিন্তু এই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী সেই। তাই রতনেরও জেল হল পাঁচ বছরের। শুধু রাশেদ কোনো শাস্তি ছাড়াই বেকসুর খালাস পেল। হাতকড়া পড়িয়ে রতনকে যখন নিয়ে যেতে থাকল তখন রাশেদের দিকে তাকিয়ে মলিন হাসি হাসল ও। রাশেদ সে হাসি ফিরিয়ে দিতে পারল না।

ঢাকায় ফিরে এল রাশেদ। সারা রাত বাসে করে এসে ভোরের নরম আলোতে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল রাশেদ। আলো এসে খুলে দিল দরজা।

আলোর কাঁধে হাত দিয়ে রাশেদ বলল, 'আমি মুক্ত আলো।'

আলোর বুক থেকে বিশাল একটা পাথর নেমে এল।

'সত্যি?'

আলোর বিশ্বাস হতে চাইছিল না। রাশেদ মাথা নাড়ল। বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুল। আলো রান্নাঘরে গেল চা বানাতে। রাশেদ ঘরে এসে বিছানায় বসল। ওর তো এখন খুব হাল্কা লাগার কথা কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে সারা শরীরে। চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন দুলছে। নাচছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। রাশেদ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু পায়ে শক্তি পেল না। নিজের অজান্তে রাশেদ সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল। শব্দ শুনে দৌড়ে এল আলো। এল পরাগ-পারুল। এল অ্যাম্বুলেন্স। মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে গেছে রাশেদের। তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে রাশেদ ঘরে ফিরে এল উদ্ভিদ হয়ে। স্মৃতিহীন-বোধহীন-প্রতিবর্তহীন মাংসপিন্ড হয়ে।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-৭

'মা, ঘরে আলো জ্বালাবে না?'

পরাগের ডাকে সম্বিত ফিরে পেল আলো। স্মৃতির ভেলায় ভাসতে ভাসতে ওর মনটা কোথায় যে চলে গেছে! সন্ধ্যা গড়িয়ে ঘরটা যে অন্ধকার হয়ে গেছে ও টেরই পায়নি। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরাগের। ওর জন্য খুব কষ্ট হয় আলোর। এত লক্ষী একটা ছেলে! মুখটা যেন একদম রাশেদের আদল। লম্বা, সুঠাম শরীর। ক্রিকেট খেলে। ঠিকমত পড়াশুনা করে। কোনো দাবী নেই। কোনো আব্দার নেই। বাবা অসুস্থ হয়ে যাবার পর কি অনায়াসে সংসারের দায়িত্বগুলো নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। বাজার করা থেকে শুরু করে বাইরের সব কাজগুলো নিজে থেকেই করে পরাগ। আলোর কোনোদিন ওকে বলতে হয় নি। খুব ভোরে ওঠে পরাগ। কিছুক্ষণ পড়ে। তারপর রাশেদের শরীরটা মুছে কাপড় বদলে দেয়। বেডপ্যান পরিষ্কার করে। বালিশে আধশোয়া রাশেদের মুখে একটু একটু করে খাবার তুলে দেয়। ঠিকমত খেতে পারে না রাশেদ। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ে। পরাগ অনেক ধৈর্য ধরে চামচ দিয়ে গড়ানো খাবার আবার মুখে তুলে দেয়। রাশেদকে ঘুম পাড়িয়ে যদি প্রয়োজন হয় তবে বাজার যায় পরাগ। প্রতিদিনতো বাজার করার টাকাটাও থাকে না। তারপর স্কুলে যাওয়ার ফুরসত মেলে পরাগের। আলো ভাবে রাশেদ চলে যাওয়ায় আগামী দু'টো মাস অন্তত পরাগ ঠিক মত পরীক্ষার প্রস্তুতিটুকু নিতে পারবে। কি নিষ্ঠুর বাস্তব! আলোর বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে।

হাসপাতাল থেকে রাশেদকে বাড়িতে নিয়ে এল আলো। একটা পয়সা হাতে নেই তখন। চারপাশে শুধু দেনা আর দেনা। আলোর কোনো ধারণাই ছিল না কি করে চলবে সংসার। বাড়ি ভাড়া, খাওয়া-খরচ, রাশেদের চিকিৎসা, ছেলেমেয়ের পড়াশুনা। কোত্থেকে যোগান হবে এ সবের? বি.এ. পড়া শুরু করতে করতে আলোর বিয়ে হয়েছিল। তারপর তো আর পড়াশুনাও করে নি। কোথাও যে চাকরি করবে তার যোগ্যতাটাও তো নেই। আর চাকরি পেলেও কি করে করবে? কে দেখাশোনা করবে রাশেদের? পরাগ পড়ে ক্লাশ নাইনে আর পারুল উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে হোম ইকনমিক্স কলেজে অনার্স পড়ছে। আলো চারদিকে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। সে দুঃসময়ে এক সকালে দরজায় কড়া নাড়লো অচেনা মাঝবয়সী এক লোক। ভারিক্কী চেহারা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পুরুষ্টু কালো গোঁফ।

'আপনি আমারে চিনবেন না। আমার নাম মির্জা শামসুল হক। সবাই আমারে মির্জা কইয়া ডাকে। সোনালী ব্যাংক এম্প্লয়ীজ ইউনিয়নের আমি সেক্রেটারী। আমার দায়িত্ব সোনালী ব্যাংকের সকল কর্মচারীর দেখ-ভাল করা। রাশেদভাইরে আমি খুব ভালো কইরা চিনতাম। আমি এখন মেইন ব্রাঞ্চে আছি কিন্তু এক সময় লালবাগ ব্রাঞ্চে আমরা একসাথে কাজ করছি। উনার মতো এরকম ভালা লোক আমি কোনদিন দেখি নাই। আমি কিছুদিন আগে খবর পাইলাম যে উনি হাসপাতালে আছেন। সময় কইরা উঠতে পারি নাই উনারে দেখতে আসার। কেমন আছেন উনি এখন?'

আলোর চোখে জল উথলে ওঠে, 'সেই তরতাজা মানুষটা আর নেই ভাই। শরীরের ডান দিকটা পুরো অবশ হয়ে গেছে। কথা বলতে পারেন না। আমাদেরকে চিনতেও পারেন না। খাওয়া-বাথরুম সব কিছুই বিছানায়।'

'আহারে এত ভালো মানুষটার এই অবস্থা। আল্লাহর যে কি খেলা বোঝা বড় দায়। শুনেন ভাবী সংসারের অবস্থা কি আমারে খুইলা কন। টাকা-পয়সা কিছু হাতে আছে? আমার কাছে লজ্জা কইরেন না। এই রকম সময়ে পাশে থাকাই আমার কাজ।'

'নারে ভাই হাতে কিছু নেই। জমানো টাকা, আমার যেটুকু গয়না ছিল সব তো গেছে মামলা চালাতে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা লোন নিতে নিতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কি করে যে সংসার চালাবো আমি কূল-কিনারা পাচ্ছি না।'

'হ মামলার কাহিনীটা আমি শুনছি। কখন যে কোন দিক দিয়া বিপদ আসে কেউ কি কইতে পারে? শুনেন আমাদের ইউনিয়নের ফান্ড আছে। সেইখান থিকা কিছু ট্যাকা আপনাদের দেওয়া যাইবো। আর রাশেদভাইতো অনেকদিন চাকরি করছে। সরকারের কাছ থিকা আর্লি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটও কিছু পাওয়া যাইতে পারে। আপনি এক কাম করেন কালকে সকালে সোনালী ব্যাংকের মেইন ব্রাঞ্চে আসেন। কিছু ফর্ম পূরণ করতে হইবো আমি সাহায্য করুম আপনারে। ফর্ম জমা হইয়া গেলে আমাদের ফান্ডের ট্যাকা তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি বাইর কইরা ফেলতে পারুম। আমাদের প্রেসিডেন্ট আর কয়েকজন মেম্বারের সাইন লাগব। সরকারের কাছ থিকা ট্যাকা বাইর করতে একটু বেশী সময় লাগব। একটু বড় অংক তো। ফাইল সেক্রেটারিয়েটে যাইব। সেইখান থিকা সাইন হইয়া আসব। চিন্তা কইরেন না আমি সেগুলা করুম নে। আপনি মনে ভরসা রাখেন।'

'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব। আমি তো সামনে কোনো উপায়ই দেখছিলাম না। এ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছে। বাড়িওয়ালা রাশেদের মুখ চেয়ে এখনো কিছু বলেনি কিন্তু দেখি মাঝে মাঝে দরজার আশেপাশে ঘুরঘুর করে। আমি যাব কালকে। আল্লাহ আপনার রূপ ধরে ফেরেশতা পাঠিয়েছেন।'

মির্জা হাসল। বলল, 'ধূর কি যে কন। ঠিক আছে আমি যাই। কালকে চইলা আইসেন।'

'একটু চা খেয়ে যাবেন না?'

'নারে ভাবী। আইজ না। আপনাদের অবস্থাটা একটু থিতু হোক তখন আইসা চা খামু নে।'

আলোর বুকের বোঝাটা অনেকটা কমে এল মির্জার সাথে কথা বলে। তাহলে কিছু একটা উপায় আছে। পরদিন পরাগকে নিয়ে মির্জার সাথে দেখা করতে গেল আলো। পারুলকে রেখে গেল বাসায় রাশেদের দেখাশোনা করার জন্য।

মির্জার খোঁজ করতে একজন বলল, 'উনারে এইখানে পাইবেন না। উনি কি আর অফিসে আসেন! আমার সাথে আসেন আমি নিয়া যাইতেছি।'

এ যেন এক গোলকধাঁধা। একের পর এক করিডর, তিন ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে বিশাল একটা ঘরে লোকটা নিয়ে এল ওদেরকে। সাথে পরাগ না থাকলে ভয়ই পেয়ে যেত আলো। কোনো বিয়েবাড়ি ছাড়া এত লোক একসঙ্গে এক ছাদের নীচে কোনোদিন আলো দেখে নি। কোনো জানালা নেই। টিমটেমে কতগুলো হলুদ বাতি ঝুলছে ছাদ থেকে। তাতে ঘরটাকে যেন আরো অন্ধকার লাগছে। ছোট ছোট অসংখ্য কাঠের টেবিল ছড়ানো ঘরটা জুড়ে। আলো মনে মনে হিসেব করে। পঞ্চাশটা কিংবা তার চেয়েও বেশী। প্রতিটা টেবিলের সাথে কাঠের চেয়ারে বসে আছে একজন করে লোক আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন।

ভালো করে চারদিক দেখে পরাগ ফিসফিস করে আলোর কানে বলল, 'মা এটা তো ডলার কেনা-বেচার জায়গা?'

আলো অবাক হল। এখানে কেন নিয়ে এসেছে ওকে? ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। লোকটা অন্য কোণ থেকে মির্জাকে ডেকে নিয়ে এল।

'আসছেন ভাবী। খুব ভালা হইছে। এই বুঝি পোলা? বাবা কত লম্বা হইয়া গ্যাছে! কি নাম বাবা তোমার? কি পড়?'

'আমার নাম পরাগ। নাইনে পড়ি।'

'বাহ বা। খুব ভালা। আপনারা এইদিকে আসেন। ওই জাহাঙ্গীর ফর্মের বান্ডিলটা নিয়া আয় তো।'

ছোট একটা ছেলে রাবারব্যান্ডে বাঁধা এক তারা ফর্ম এনে দিল মির্জার হাতে।

সেখান থেকে বেছে দু'টো ফর্ম বের করল মির্জা, 'এই দুইটা ফর্ম পূরণ করেন। একটা আমাদের এইখানের আর একটা সরকারের।'

একটা টেবিলের আশে পাশে কেউ ছিল না।

মির্জা বলল, 'এইখানে বইসা লিখা ফেলেন।'

আলো ফর্মদু'টো পরাগকে দিল লেখার জন্য। নাম-ঠিকানা-বয়স এ ধরণের সাধারণ তথ্য। বেশী সময় লাগলো না পূরণ করতে।

মির্জা বলল, 'চিন্তা কইরেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই ফান্ডের ট্যাকাটা আমি বাড়িতে যাইয়া দিয়া আসুম। সেক্রেটারিয়েটে হয়তো একদিন আপনেরে যাইতে হইতে পারে। আমি জানামু নে আপনেরে।'

'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব।'

'এইটাতো আমার কর্তব্য। এইটা করার লাইগাই তো আমারে ভোট দিয়া সেক্রেটারী বানাইছে। যারা আমারে নির্বাচিত করছে তাদের পাশে যদি নাই থাকতে পারলাম তাইলে লাভটা হইলো কি? আপনারা বাইর হওয়ার পথ খুঁইজা পাইবেন তো? ওই জাহাঙ্গীর উনাদের বাইর হওয়ার রাস্তাটা দেখায়া দে তো।'

ভেতরের অন্ধকার থেকে দুপুরের প্রখর সূর্যালোকে বের হয়ে এসে আলোর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মির্জা যা বলছে তা সত্য হবে তো? এতে আপাতত সমস্যা মিটবে কিন্তু তারপর? ওকে কোনো না কোনো ভাবে তো সংসারের হালটা ধরতে হবে। কি করতে পারে ও? আলো মনে মনে বিভিন্ন উপায় ভাবতে থাকে।

বাসায় ফিরতে পারুল বলল, 'মা, বাড়িওয়ালা এসেছিলেন। বললেন আমি যদি উনার মেয়ে দু'টোকে পড়াই তা হলে বাড়ি ভাড়া পাঁচশ টাকা কম রাখবেন।'

বাড়িওয়ালার মেয়েরা তৃতীয় আর পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে।

'পারবি তুই মা? তোর পড়াশুনা চালিয়ে ওদেরকে পড়াতে?'

'কি যে বলো না মা? ওদেরকে পড়ানো কোনো ব্যাপার হলো। আমি বিকেল আর সন্ধ্যা মিলে ঘন্টা দু'য়েক ওদের পড়া দেখিয়ে দেব তা হলেই হবে।'

আলো জড়িয়ে ধরল পারুলকে। ধীরে ধীরে যেন ভবিষ্যতের ঘন আঁধারটা ফিকে হয়ে আসছে। একটার পর একটা বাধা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে শক্ত মাটির স্পর্শ করতে পারছে। আলোর মনে সাহস জাগে।

মির্জা এলো তিনদিন পর। বাড়িতে রাশেদকে নিয়ে একা ছিল আলো।

'ভাবী আমরা ফান্ড থিকা তিরিশ হাজার ট্যাকা ম্যানেজ করতে পারছি। আমি ট্যাকাটা সাথে নিয়া আসছি। এতগুলা ট্যাকাতো ঘরে রাখা ঠিক না। আপনি আমার সাথে চলেন ব্যাংকে ট্যাকাটা জমা দিয়া দেন।'

'কিন্তু ঘরে তো এখন কেউ নেই। উনাকে কে দেখবে?'

'আশেপাশে কেউ নাই যে কিছুক্ষণ বসতে পারে? আপনের ব্যাংক কতদূর?'

'আমাদের একাউন্টতো উনার ব্রাঞ্চে।'

'ও তাইলেতো বেশী দূর না। রিক্সা কইরা যাইতে আসতে আধা ঘন্টা লাগব। দেখেন না কাউরে পান কিনা? আর না পাইলে আধা ঘন্টা রাশেদভাই একা একা মনে হয় থাকতে পারবো।'

আশেপাশের প্রতিবেশী কাউকেই আলো খুঁজে পায় না। মির্জার ভরসায় রাশেদকে একা রেখেই আলো মির্জার সাথে রিক্সায় উঠে আসে। প্রখর রোদ বাইরে। মির্জা রিক্সায় উঠে হুড তুলে দেয়। রিক্সার স্বল্প পরিসরে আলোর কনুই মির্জার হাতের সাথে ঘষা খেতে থাকে। ঝাঁকুনীতে আলোর হাঁটু বাড়ি খেতে থাকে মির্জার উরুর সাথে। রাশেদ ছাড়া জীবনে আর কোনো পুরুষের এত কাছাকাছি কখনো হয়নি আলো। খুব বিব্রত লাগতে থাকে ওর। ভাগ্যিস পথটা বেশী নয়। মির্জা থাকায় টাকাটা জমা দিতে এক মিনিটও লাগলো না।

মির্জা ওর হাতে চার হাজার টাকা তুলে দিয়ে বলল, 'এই নেন, বাড়ি ভাড়া দিয়েন আর মাসের খরচ চালাইয়েন।'

ফিরতি পথে মির্জা সাথে এল আলোর। মির্জার কনুই মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আলোর বুক। আলো ঠিক বুঝতে পারছিল না রিক্সার ঝাঁকুনীতে কি এ রকম হচ্ছে নাকি মির্জা ইচ্ছে করে করছে। অস্বস্তিতে শরীর শিউরে উঠছিল আলোর।

বাড়ির দরজায় এসে মির্জা বলল, 'ভাবী, একটু চা খাওয়াইবেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই আপনি এত বড় একটা উপকার করলেন আপনাকে কি আমি খালি মুখে যেতে দিতে পারি?'

'উপকার না। এইটা আমার কর্তব্য।'

আলো ঘরে এসে দেখল রাশেদ তখনো ঘুমিয়ে আছে। রান্নাঘরে গিয়ে চা বানিয়ে আনলো মির্জার জন্য। নিজের জন্যও বানালো এক কাপ। মির্জা রসিয়ে রসিয়ে চা খেল। টুকটাক গল্প করল।

তারপর বলল, 'আইজ আসি। কাইল-পরশু নাগাদ সেক্রেটারিয়েটে যামু আমি। দেখি কতদূর কি করা যায়।'

সেদিন অনেকদিন পর আলো ভালো করে রান্না করল। একটা লাউ আর দু'টো ডিম ছিল ঘরে। লাউ-এর খোসা ভাজি করলো সর্ষে দিয়ে। মুগ ডাল দিয়ে লাউ। ডিম সেদ্ধ করে মাংসের মতো করে ভুনা। বিকেলে পরাগ-পারুল বাড়ি ফিরে তো অবাক হয়ে গেল।

'এতো দেখি রীতিমত ফিস্ট মা!'

দিনের পর দিন সেদ্ধ-ভাত খেয়ে খেয়ে এই সাধারণ রান্নাটুকুই ওদের কাছে রাজার প্রসাদ হয়ে উঠল।

কোনোভাবে আয়ের পথ খুঁজছিল আলো। বড় রাস্তায় একটা মহিলা হাসপাতাল আছে। ওই হাসপাতালের একজন নার্স রুমা ওদের কাছেই থাকে।

রুমা বলল, 'আলো আপা আপনিতো কাজ খুঁজছেন, আমাদের হাসপাতালে রাতের আয়ার খুব অভাব। রাতের বেলা ডিউটি দিতে পারবেন? সারা রাত রোগীর কাছে থাকতে হবে। তাদের যা দরকার তা এগিয়ে দিতে হবে। বাথরুমে নিয়ে যেতে হবে। করতে চান এ রকম কাজ?'

আলোর একটা কাজ দরকার। বাছাবাছি করার কি ওর কোনো পথ আছে? তাছাড়া রাতের বেলা কাজ হলে তো ভালোই। দিনের বেলা ও বাসায় থাকলে পরাগ-পারুলের পড়াশুনা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আলো রাজী হয়ে গেল। প্রতিরাতে পঞ্চাশ টাকা। তাদিয়ে সংসারটা ঠেকা দিয়ে তো রাখতে পারবে। কাজ শুরু করে দিল আলো। ওর ভাগে প্রথম রুগী পড়ল এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। জরায়ু অপসারণ করা হয়েছে আগের দিন। অ্যানেসথেটিক আর ব্যথার ওষুধের প্রকোপে তখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সবাই চলে যায়। তখন আলোর ওপর পড়ে দেখাশোনার ভার। এ হাসপাতালে রাতের আয়াদের রাখা হয় মূলত নার্সদের কাজে সাহায্য করার জন্য। রাশেদকে যত্ন নিতে

নিতে আলো এমনিতেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছিল। কি করে ক্যাথেটার বদলাতে হয়, রাইলস টিউব দিয়ে খাবার দিতে হয়, বেডপ্যান বদলাতে হয় এগুলো আলো শিখেছিল রাশেদ হাসপাতালে থাকতেই। কাজের মধ্যে ঢুকে যেতে আলোর বেশী বেগ পেতে হলো না।

পরাগ-পারুল বেরিয়ে যাবার পর রাশেদের বিছানার পাশে বসে আলো ঢুলছিল। সারা রাত কাজ করার পর দিনের এ সময়টা চোখ ফেটে ঘুম আসে আলোর। মির্জা হাজির হলো এমন সময়। সাথে দু'টো ফর্ম নিয়ে এসেছে।

বলল, 'সেক্রেটারিয়েটে গেছলাম। আরো দুইটা ফর্ম পূরণ করতে হইবো। আর একদিন আপনারে যাইতে হইবো আমার সাথে। কবে যাইতে পারবেন কন। আমার লাইগা কাইল অথবা পরশু হইলে খুব ভালা হয়।'

আলো বলল পরশুদিন যাবে। মির্জা বসলো না সেদিন। বলল তাড়া আছে।

পরাগকে নিয়ে আলো সেক্রেটারিয়েটের গেটে হাজির হল সকাল ন'টার সময়।

মির্জা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য, 'আপনাদের লাইগা পাস নিয়া রাখছি। চলেন ভিতরে চলেন।'

মির্জার পেছন পেছন আবার অসংখ্য গোলকধাঁধা পার হয়ে ওরা এসে পৌঁছল এসিস্টেন্ট সেক্রেটারীর অফিসে। বাইরে পিওন বসে আছে।

মির্জা বলল, 'আমার ফাইলটা হইছে নাকি রকীবমিয়া? এইযে ভাবীরে সঙ্গে কইরা নিয়া আসছি।'

'আপনের ফাইল সেইটা আটকাইয়া রাখে কার সাধ্য? সব সাইন হইয়া গেছে। শুধু চেক ইস্যু করা বাকী। তয় আইজকে সার নাই কাজেই চেক দিতে পারুম না। আপনারে আবার আইসতে হইবো।'

'এইটা কি কইলা রকীবমিয়া? ভাবীর হাতে যাতে সার চেকটা তুইলা দেয় তাইতো উনারে সাথে কইরা নিয়া আইলাম। ধূর দিনটাই মাটি হইয়া গেল। তা সার আসবো কবে?'

'কাইলকেই আসবো। আমি কমুনে আপনি ভাবীরে নিয়া আসছিলেন। আপনি কাইলকে আইসা চেকটা নিয়া যায়েন।'

ওরা বের হয়ে এল।

মির্জা বলল, 'কি আর করবেন ভাবী বাড়ি চইলা যান। আমি চেকটা পাইলে আপনারে দিয়া আসুম নে।'

দু'দিন পর মির্জা এল চেকটা হাতে নিয়ে। মুখে ছড়ানো হাসি।

'কতটাকার চেক কন তো দেখি? এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। কে এই চেকের পিছনে কাজ করছে দেখতে হইবো না?'

চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে মির্জা হাতে নিয়ে চেকটা দুলাতে থাকে। আলো হাত বাড়ায় চেকটা নেওয়ার জন্য কিন্তু মির্জা দেয় না। আলো তাকায় মির্জার মুখের দিকে। মির্জার মুখ থেকে হাসিটা মুছে গিয়ে দুর্বোধ্য কাঠিন্য স্থান পেয়েছে। চশমাটা খুলে ফেলেছে মির্জা। ছোট ছোট চোখ দু'টো আরো ছোট হয়ে এসেছে।

'এইযে আমি এত কিছু করলাম আমার পুরস্কার?'

আলো ম্লান হাসল, 'আপনাকে আমি কি পুরস্কার দেব বলেন? আমার কি কিছু আছে দেবার মতো। আপনি মহানুভব মানুষ তাই আমাদের জন্য এত করেছেন। আপনার উপকার কি কোনোদিন শোধ দেয়া যায়?'

'পুরস্কার আছে। আপনি বোঝেন না কি পুরস্কার চাই?'

দাঁতে দাঁত চেপে বলল মির্জা। মির্জার গলার স্বরে ভয় পেয়ে গেল আলো। মির্জার চোখ দু'টো সটান তাকিয়ে আছে ওর বুকের দিকে। মির্জা ওকে চায়? আলো হতবাক হয়ে গেল। দু' সন্তানের জননী

ও। চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে ওর। ও যে কারো চাওয়ার কেন্দ্র হতে পারে আলো তা ভাবতেও পারে নি। সংসারের ঘানি টানতে টানতে কোনোদিন নিজের দিকে তাকাবার সময় পায়নি আলো। শরীরে মেদ জমেছে। পায়ের গোড়ালি, কনুই খসখসে হয়ে গেছে। চোখের কোলে জমেছে কালি। ছোটবেলা থেকেই সবাই বলতো ও খুব সুন্দর দেখতে। বিয়ের পর রাশেদের মুখে ওর সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছে কত বার কত আদরের ভাষায়। এত টানাপোড়েন, এত অঘটন, দুর্ঘটনার পর কিছু অবশিষ্ট আছে সেই সৌন্দর্যের যা কাউকে টানতে পারে?

আলোর চোখে জল ছলকে ওঠে, 'কি বলছেন আপনি এসব?'

'এই চেকটা চাই আপনের? তাইলে আমি যা কই তাই করেন। আসেন এদিকে আসেন আমার।' ধমক দিয়ে ওঠে মির্জা।

মির্জার কথা শুনে রক্ত উঠে যায় আলোর মাথায়।

'বের হয়ে যান আপনি বাড়ি থেকে। আপনার এত বড় সাহস? আপনি কি ভেবেছেন আমাকে? আমি ভেবেছি আমার ভালোমানুষ স্বামীকে সাহায্য করার জন্য আপনি এত কিছু করেছেন। আপনার মনে এত বড় পাপ?'

'পাপ? কিসের পাপ? আমি এত কিছু করুম আর তার বদলে কিছু চাইতে গেলেই পাপ?'

মির্জা উঠে আসে চেয়ার থেকে। আলোর সামনে এসে কাঁধে হাতে রাখে। ফেলে দেয় আঁচল। মির্জার থাবার ভেতর কুঁকড়ে ওঠে আলো। দু'হাতে দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে মির্জাকে। মির্জা হটে যায় দু' পা। ওর মুখে হিংস্র হাসি খেলে ওঠে।

'ও, মাগীর দেখি ভালাই জোর আছে?'

আঁচলটা ঠিক করে আলো উঠে দাঁড়ায়।

'বেরিয়ে যান আপনি না হলে আমি চিৎকার করে পাড়া জড়ো করব।'

মির্জা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুত পায়ে ঢুকে যায় ভেতরের ঘরে। একটা বালিশ নিয়ে চেপে ধরে রাশেদের মুখের ওপর।

'কি ভাবছস তুই আমারে। এত সহজে তোরে ছাইড়া দিমু আমি? খুব পতিপ্রেম না? তিন মিনিট ধইরা রাখুম আর তারপর তোর সাধের সোয়ামী বেহেসতের হাওয়া গায়ে মাখাইতে থাকব।'

আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে মির্জার ওপর। মির্জা এক হাতে বালিশটা চেপে ধরে অন্য হাতে বাধা দিতে থাকে আলোকে। আলো কিছুতেই রাশেদের কাছে পৌঁছতে পারে না। বালিশের চাপে রাশেদের ভেতর থেকে আর্ত গোঙানি বের হয়ে আসে। আলোর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

হাল ছেড়ে দেয় আলো, 'দোহাই আপনার ওকে ছেড়ে দিন। ও তো আপনার কোনো ক্ষতি করে নি। ওর জীবনটা ভিক্ষা দিন।'

'মির্জা বিনা পুরস্কারে কোনো কিছু করে না। ক তুই রাজী?'

আলোর মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না। পায়ে কোনো জোর পায় না ও। হাঁটু ভেঙে চোখ বন্ধ করে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ে ও। চোখ খোলে না আলো। টের পায় মির্জার থাবা পশুর মতো খুবলে নিচ্ছে ওর সম্ভ্রম, লেহন করছে ওর বুক, পেট, জঙ্ঘা। চোখ বুঁজে আলো অন্য কিছু ভাবতে চায়। মনটাকে নিয়ে যেতে চায় জাগতিক সমস্ত কলুষতা, সমস্ত কালিমার উর্ধ্বে। মির্জার শরীরের ভার নিয়ে আলো মিশে যায় মাটির সাথে। তারপর কখন জানি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কি এক অদ্ভুত শব্দে ঘোর ভাঙে আলোর। প্রথমে বুঝতে পারে না কোথায় আছে ও। কি হয়েছে। তারপর তাকিয়ে দেখে বিছানার ওপর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রাশেদ। প্রাণপণ চেষ্টা করছে কি যেন বলতে। ওর গলার ভেতর থেকে বোবা পশুর গোঙানির মতো আর্ত শব্দ বের হয়ে আসছে। চোখ থেকে অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। আলো উঠে বসে। ও কোনো কিছু অনুভব করতে

পারে না। যন্ত্রের মতো ব্লাউজের বোতাম লাগায়। সায়ার ফিতাটা বাঁধে। শাড়িটা ঠিক করে গায়ে জড়ায়। রাশেদের কাছে এসে মাথাটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। রাশেদ কি দেখেছে সব কিছু? কিছু বুঝেছে ও? আলো মুখটা রাশেদের খুব কাছে নিয়ে আসে।

'আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমি কিছুই রক্ষা করতে পারলাম না।'

আলোর চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে রাশেদের গালে। রাশেদের চোখের জলের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

আলোর ঘোর ভাঙে পারুলের কণ্ঠে।

'একি মা, দরজা খোলা কেন?'

আলো টের পায় বাইরে থেকে পারুল ঘরে এসে ঢোকে।

তারপরই চিৎকার করে ওঠে পারুল, 'এটা কি মা? তুমি টেবিলের ওপর এভাবে ফেলে রেখেছ কেন?'

চেকটা হাতে নিয়ে পারুল দৌড়ে ঘরে ঢোকে।

'এত টাকা?'

পারুলের মুখটা হাসির ছটায় স্ফুরিত হয়ে ওঠে। মেয়েকে অনেকদিন এত প্রাণ খুলে হাসতে দেখে নি।

আলো একবার ভাবে বলে, 'ফেলে দে ওটা।'

তারপর ভাবে যা হবার তাতো হয়েই গেছে। মির্জাতো চেকটা নাও রেখে যেতে পারতো। স্বামীর জন্য ছেলেমেয়ের জন্য নিজের এটুকু নাহয় দিয়েই দিল আলো। ওর তুচ্ছ এই শরীরটার বিনিময়ে যদি এই সংসারটা ঠিক থাকে যদি ছেলেমেয়ের পড়াশুনাটা ঠিকমত হয় তাহলে ওর না বলার কি অধিকার আছে? পারুল এসে জড়িয়ে ধরে আলোকে। তারপর বাবা-মার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দু'টোও জলে ভরে ওঠে। তিনজনের চোখের জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

পারুল উঠে বসে।

চোখটা মুছে মার দিকে মুখ তুলে তাকায়, 'মা, আমি বিয়ে করতে চাই।'

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-৮

দু'টো ক্লাশের মাঝখানে ঘন্টা দুয়েক ফাঁক ছিল। পারুল হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটে বইয়ের দোকানে চলে এল সময় কাটাতে। বান্ধবীদের সাথে গল্প করতে কেন জানি ভালো লাগছিল না। ওর বান্ধবীরা সবাই বেশ সচ্ছল পরিবারের। ওর মতো প্রতিদিন দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করতে হয় না ওদের। দিনের পর দিন সেদ্ধ-ভাত বড়জোর ছোট মাছ দিয়ে ওদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হয় না। ফ্যাশান-হিন্দী সিনেমা-কনসার্ট এসব গল্পের সাথে তাল মিলাতে পারে না পারুল। নিজেকে বড় অসহায়, একাকী লাগে। সামনে পরাগের জন্মদিন। ওকে কি একটা বই কিনে দেয়া যায়? কি লক্ষী ভাইটি ওর। কোনো দাবী নেই, কোনো রাগ নেই। পারুলের মাঝে মাঝে প্রতিদিনের এই জীবন-সংগ্রাম অসহ্য হয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়। রাগ হয় মা-বাবার ওপর। মুখে কিছু বলে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে গুমরায়। পরাগকে কোনোদিন বিরক্ত হতে দেখে নি পারুল। বাবা যখন মামলার তাগিদে চলে যেত তখন মা কিছু না বলতেই অনায়াসে বাইরের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিত পরাগ। আর এখন বাবা অসুস্থ হয়ে যাবার পর তো পরাগ যেন অতিমানুষ হয়ে উঠেছে। ইদানীং বড়দের বই পড়ার অনুমতি পেয়েছে পরাগ। ওকে কি কিনে দেয়া যায়? টাকার অংকটাও চিন্তা করতে হবে। প্রতিদিন মা ওকে দশটাকা দেয় রিক্সাভাড়া হিসেবে। পারুল কোনোদিন তার পুরোটা খরচ করে না। অনেকটা পথ হেঁটে তারপর রিক্সা নেয়। কোনো কোনোদিন ফিরেও আসে পুরোটা পথ হেঁটে। মা কিছু জানে না। প্রায় শ' পাঁচেক টাকা জমেছে পারুলের। কোনো বিশেষ কিছু কেনার জন্য যে টাকা জমাচ্ছে পারুল তা নয়। ও জানে টানাপোড়েনের সংসারে এই টাকাটাই কোনোদিন কাজে লাগবে। তাছাড়া নিজের ছোটখাট প্রয়োজনও তো আছে।

একটা কবিতার বইয়ের ওপর ঝুঁকে ছিল পারুল। নতুন কবির বই।

নাম 'পায়ের নীচে বুকের কাছে'।

পরাগ কবিতা পড়তে ভালোবাসে। পারুল উল্টে পাল্টে কবিতাগুলো দেখছিল। বেশ লাগছিল পড়তে। কি সুন্দর শব্দচয়ন, ভাষার বিন্যাস! পারুল ভাবছিল পরাগকে কিনে দেয়া যায়।

'কি পড়ছো এতো মনোযোগ দিয়ে?'

কানের কাছে পরিচিত কণ্ঠস্বরে পারুল চমকে ওঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রূপম। ওর বান্ধবী কবিতার বড় ভাই। অন্য সবার চেয়ে কবিতা পারুলের সবচেয়ে কাছের। খুব ধনী পরিবারের মেয়ে। লালবাগ কেল্লার উল্টো দিকে ওদের প্রাসাদের মতো বাড়ি। বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা ওদের। পড়াশুনা করার কোনো দরকার নেই ওদের কিন্তু কবিতার বাবার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ওপর কড়া নজর। কবিতাকে খুব ভালো লাগে পারুলের। পড়ালেখায় ভালো। দেখতে সুন্দর। অথচ কোনো অহংকার নেই। মাঝে মাঝে কলেজ ফেরত পারুলকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে যায় কবিতা। কবিতার ঘরে শুয়ে গান শোনে। খুব মজার মজার রান্না হয় কবিতাদের বাড়ি। পারুলের সবচেয়ে ভালো লাগে শিক কাবাব আর রুমালি রুটি। যেন বেহেশতের কাছাকাছি চলে যায়।

কবিতার সাথে যাতায়াত করতে করতেই পারুলের পরিচয় হয়েছিল রূপমের সাথে। প্রথমদিন বারান্দায় পারুলকে দেখে চমকে গিয়েছিল রূপম। পারুলের মুখশ্রীতে এমন একটা মায়া আছে যা পুরুষের মন দোলাবেই। উজ্জ্বল শ্যামের চেয়ে আরো একটু পরিষ্কার গায়ের রং কিন্তু ধবধবে ফর্সা নয়। এই হাল্কা বাদামী আভা ওর ত্বকে বাড়তি ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। পানপাতার মতো গোল মুখ। টানাটানা

চোখ। এত গহন আর লম্বা পাপড়ি যে কাজল দিতে হয় না। কোমর গড়ানো চুল মাঝখানে সিঁথি করে পাট করে আঁচড়ানো। পারুল যত্ন করে চুলের। মা নিয়মিত তেল মেখে দেয়। কোনোদিন বিনুনী করে না পারুল। ওর পিঠের ওপর চকচকে কালো চুল জলপ্রপাতের মতো অঝোর ঝরতে থাকে। ছিপছিপে লম্বা ওর দেহের গড়ন। মার সাথে বেশ মিল আছে পারুলের। পারুলের দিকে অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল রূপম। পারুল মুখ নীচু করে ওড়নায় হাসি চাপা দিয়ে চলে গিয়েছিল সামনে থেকে। তারপর একটু একটু করে কথা হয়েছে। রূপমের চোখে পারুল দেখেছে মুগ্ধতা। বি. কম. পাশ করে বাবার সাথে ব্যবসা দেখছে রূপম। তার সাথে এম.বি.এ.-র ক্লাশ করছে রাতে। পারুলের সাথে দেখা হবার সুযোগ মেলে কালেভদ্রে। যখন দেখা হয় তখন টুকটাক সাধারণ কথা হয় ওদের দু'জনের কিন্তু পারুল টের পায় তার বাইরে কি যেন বলতে চায় রূপম। কোনো এক অজানা সংকোচে বলতে পারে না।

অনেক ব্যবসার মধ্যে নিউ মার্কেটে শাড়ির দোকান আছে রূপমদের। রূপম এসেছিল হিসাবপত্র বুঝে নিতে। ফেরার পথে বইয়ের দোকানের সারি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখা হয়ে গেল পারুলের সাথে। চার দেয়ালের বাইরে এই প্রথম পারুলের সাথে রূপমের সাক্ষাৎ। পারুল বইটা কিনে রূপমের সাথে বাইরে বেরিয়ে এল।

'কি বই কিনলে?' জিজ্ঞেস করল রূপম।

'একটা কবিতার বই। পরাগের জন্মদিনের উপহার।'

'বা বা পরাগ কবিতাও পড়ে! কেমন কবিতাগুলো? বিষয় কি?'

'নতুন কবি। আগে কখনো পড়িনি। জীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েন, নানা অভিজ্ঞতা, প্রেম এসব নিয়ে লেখা।'

'তাই নাকি? তবেতো পড়ে দেখতে হয়।'

'পরাগের পড়া হলে আপনাকে দেব।'

'এক কাজ করা যায় না তুমি আমাকে এখন পড়ে শোনাবে নাকি?'

'এখন? আমার তো ক্লাশ আছে একটু পরে।' পারুল আমতা আমতা করে।

'চল, টি.এস.সি.তে গিয়ে বসি। বেশী তো দূর নয়। আর আজকে না হয় একটা ক্লাশ মিস হলই।'

পারুল না বলে না। দুপুর প্রায় দু'টো বাজে। গনগনে রোদে পিচ গলে যাচ্ছে। রোদ থেকে বাঁচার জন্য ওড়না দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিয়েছে পারুল। রিক্সায় পাশাপাশি বসে আছে ওরা। এই প্রথম কোনো ছেলের সাথে রিক্সায় উঠে বসল পারুল। বেশ লম্বা রূপম। পারুলের মাথা রূপমের ঘাড় ছুঁয়ে আছে। পারুলের ইচ্ছে করছে রূপমের কাঁধে মাথা রাখতে। ওর মনে হচ্ছে রূপমের স্পর্শে ও হয়তোবা ভুলে যেতে পারবে প্রতিদিনের কষ্টকর জীবনযাপন। নিউ মার্কেট থেকে টি.এস.সি. অল্প একটু পথ। এই স্বপ্ন-কল্পনার মেঘে বেশীক্ষণ ভেসে থাকতে পারলো না পারুল।

টি.এস.সি.র ঘাসের ওপর ওরা দু'জন এসে বসল। কোথা থেকে যেন মেঘ এসে সূর্যটাকে আড়াল করে দিয়েছে। ঘন ছায়া নেমে এসেছে। রূপম সিঙ্গারা আর কোক কিনে আনল। পারুল প্যাকেট থেকে বইটা বের করে আনল। চেষ্টা করতে থাকলো কবির আবেগ বুঝতে। সেই আবেগটা কণ্ঠে এনে কবিতাটা পড়তে। রূপম মুগ্ধ হয়ে পারুলের দিকে তাকিয়ে রইল। পারুলের পুরো অনুভব আপ্লুত হয়ে গেছে কবিতার মায়ায়। চোখদুটো নিবদ্ধ বইয়ের পাতায়। পাতলা ঠোঁটদুটো হাল্কা ফাঁক হয়ে উচ্চারণ করছে কারুকাজময় বাক্যবিন্যাস। পারুলের থুতনিতে একটা হাল্কা খাঁজ আছে। রূপমের খুব ইচ্ছে করছে সেখানটায় ঠোঁট ছোঁয়াতে।

পারুল পড়তে থাকে

অষ্টপ্রহর কষ্টে থাকি, বাসলে ভালো, বাসলে নাকি-
একটু না হয় বললে বাসি-
সহজ সরলে।

রূপম হাসে, বলে, 'আমার মনের কথা।'

পারুল ভ্রূভঙ্গী করে তাকায় রূপমের দিকে, 'তাই নাকি? কার জন্য এই ভালোবাসা? কে সেই জটিল ব্যক্তিটি, হ্যাঁ?'

রূপমের মুখ থেকে হাসি সরে যায়। বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। বলে, 'তুমি বোঝো না পারুল?'

পারুলের বুকের গভীরে আনন্দ যেন সাগরের ঢেউয়ের মতো ফেনিল হয়ে ওঠে। ওর হৃৎপিন্ডটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে চলে আসে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। কোনো কথা বলতে পারে না ও। মাথাটা নত করে ফেলে। তারপর চোখ ফেটে কান্না আসে। রূপম ওকে ভালোবাসে? ওকে যে কেউ ভালোবাসতে পারে এই বোধটাই তো কোনোদিন হয়নি ওর। দিনের পর দিন অর্থনৈতিক দৈন্য ওকে কোনোদিন স্বপ্ন দেখার সাহস দেয়নি। অন্যদের সাথে তুলনায় নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর, তৃণসম মনে হয়েছে। সেই ওকে রূপম ভালোবাসে? ওড়নায় মুখটা ঢেকে পারুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। আশেপাশের সবাই চোখ মেলে দেখল একটা মেয়ে কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে আর একটা ছেলে পাশে বসে কি করবে কিছুই বুঝতে না পেরে অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে।

নিজেকে সংবরণ করে নিল পারুল। চোখ মুছে মুখটা পরিষ্কার করে রূপমের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ভালোবাসি' বলার কোনো দরকার হলো না। হৃদয়ের গভীর দিয়ে ওরা উপলব্ধি করল ওরা একে অপরকে ভালোবাসে। প্রথম প্রেম যেন লুকোচুরি খেলা। আগে সবার সামনে রূপমের সাথে দেখা হলে পারুল কিছু একটা কথা বলত। এখন মাথা নীচু করে চলে যায়। সকালে যখন কলেজে যায় অনেক সময় পথে দেখা হয়ে যায় রূপমের সাথে। পারুল না দেখার ভান করে। রূপমও পাড়ার মাঝে পারুলের সাথে কথা বলার সাহস করে না। সারাদিন কাজের ফাঁকে রূপম একটু সময় বের করার চেষ্টা করে। পারুল চেষ্টা করে কবিতাকে ফাঁকি দিয়ে একটু সময়ের জন্য উধাও হয়ে যেতে। ওদের দেখা হয় নিউ মার্কেটে বইয়ের দোকানে। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে। আজিজ সুপার মার্কেটে। শুধু কথা বিনিময়। চোখে চোখ রাখা। কোনো স্পর্শ নেই। কাছে আসা নেই।

রূপমের সহ্য হয় না আর। পারুলকে বাহুবন্দী করার জন্য ওর অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

পাবলিক লাইব্রেরীর পেছনে সিঁড়িতে বসে রূপম একদিন বলে, 'পারুল চল আমরা বিয়ে করি।'

রূপমের প্রস্তাবে শিহরণ জাগে পারুলের শরীরে। তারপর বাস্তবটুকু চিন্তা করলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

বলে, 'তোমার বাড়িতে মেনে নেবে রূপম? জানোইতো আমাদের বাড়ির অবস্থা। বাবা বিছানায়। মা হাসপাতালে আয়ার কাজ করে, আমি বাড়িওয়ালার মেয়েদের পড়াই। এই দিয়ে আমাদের সংসার চলে। এরকম একটা পরিবারের মেয়েকে বউ হিসেবে আনতে রাজী হবেন তোমার বাবা-মা? আমরা তো কিছুই দিতে পারবো না তোমাদের। না টাকা-পয়সা, না সম্মান।'

পারুলের কথায় চমকে ওঠে রূপম। এত কিছু ভেবেছে পারুল? পারুলের জন্য ওর ভালোবাসা আরো গভীর হয়ে ওঠে।

বলে, 'তোমাকে তো বাবা-মা সেই কবে থেকে চেনে? মা তোমাকে খুবই ভালোবাসে। আমি বললে মনে হয় না ওরা না করবে। আর তুমি তো জানোই বাবা কতো উদার। আমাদেরকে পড়ালেখা

শিখিয়েছেন যেন আমরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারি। তুমি রাজী থাকলে আমি আজকেই মাকে বলব।'

পারুলের কি না করার কোনো উপায় থাকে? ওর ভালোবাসার মানুষ ওকে স্ত্রী হিসেবে চাইছে এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে? দারিদ্রময় বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ও পাখা মেলে উড়তে পারবে তা চিন্তা করেই ওর হর্ষ হতে থাকে। তাছাড়া ধনী পরিবারে গেলে হয়তোবা অর্থনৈতিকভাবেও সাহায্য করতে পারবে মাকে, পরাগকে। হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরে আসে পারুল সেদিন। দেখে দরজা খোলা।

'একি মা, দরজা খোলা কেন?'

তারপর টেবিলের ওপর চেকটা দেখে ওর বিশ্বাস হতে চায়না। এত সুখবর সব এক দিনে? ভিতরে এসে দেখে বাবার মাথাটা বুকের সাথে চেপে ধরে অঝোর ধারায় কাঁদছে মা। বাবার চোখ দিয়েও ঝরে পড়ছে অশ্রু। কি গভীর ব্যথায় কুঁকড়ে আছে বাবার মুখ। পারুলের বুকটা ধ্বক করে ওঠে। কান্না সংক্রামক। মাকে জড়িয়ে ধরে পারুলও কেঁদে ওঠে প্রাণখুলে।

কান্না প্রশমিত হয়ে এলে পারুল মাকে জানাল রূপমের কথা। বিয়ের প্রস্তাবের কথা। আলোর বুক ভেঙে কান্না উথলে এল। এ কি দুর্বোধ্য প্রবাহ নিয়তির? পারুলের বিয়ে যদি হয় কি বিশাল একটা বোঝা মাথার ওপর থেকে নেমে যাবে আলোর। এই টাকাটা দিয়ে মেয়েটাকে কিছুটা হলেও সাজিয়ে দিতে পারবে। এর বিনিময়ে কি দিতে হল ওদের? আলোর সম্মান-সম্ভ্রম? আর ওই যে মানুষটা বিছানায় বন্দী হয়ে আছে তারতো সব হারিয়ে গেল জীবন থেকে। শরীরটাতো অচল হয়েইছে যেটুকু বোধ ছিল তাও যেন আজ কশাঘাতে অবশ হয়ে গেছে।

চোখ মুছে আলো বলল, 'রূপমকে বল ওর বাবা-মার সাথে কথা বলে আমাকে জানাতে।'

পরদিন বিকেলেই রূপম বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল।

বলল, 'বাবা-মা রাজী। তবে বাবা বলেছেন আপনাদের তো একটু দুঃসময় চলছে এখন আনুষ্ঠানিকতাটুকু না করতে। আমরা রেজিস্ট্রি করি। তারপর পারুল ঘরে এলে বাবা একটা রিসেপশন দেবেন। সেখানে আমাদের আর আপনাদের আত্মীয়স্বজন এসে আমাদের দোয়া করবেন। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আগামী সপ্তাহেই আমরা রেজিস্ট্রিটা করতে চাই।'

আলো বলে, 'আমার তো একটাই মেয়ে বাবা। ওকে তো আমি খালি হাতে যেতে দিতে পারি না। আমাকে আর একটু সময় দাও। আমি একটু গুছিয়ে নেই।'

'সে সবের কিন্তু কোনো দরকার নেই। আমি পারুলকে ভালোবাসি। আমি শুধু ওকেই চাই।' রূপম মাথা নীচু করে বলল।

'তা আমি জানি বাবা। কিন্তু মা হিসেবে আমারতো একটু কর্তব্য আছে। আমারও তো মেয়েটাকে সাজাতে ইচ্ছে করে। তুমি এ মাসের শেষ পর্যন্ত আমাকে সময় দাও। আমি গুছিয়ে নিতে পারবো সবকিছু।'

সারারাত কাজ করে পরদিন পারুলকে বাড়িতে রেখে ছবিভাবীর কাছে গেল আলো। ছবিভাবী তো শুনে আনন্দে আটখানা। গাউছিয়া মার্কেটে দু'জনে মিলে ঘুরে ঘুরে শাড়ি পছন্দ করল। নতুন ডিজাইনের গহনা বানাতে দিল। সারাদিন পার হয়ে গেল এসব করতে। সন্ধ্যায় হাতভর্তি ব্যাগ নিয়ে ছবিভাবী বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেল আলোকে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর ওকে আবার কাজে যেতে হবে। পারুলকে সব দেখাতে খুশীতে টগবগ করে উঠল ও। রক্তবর্ণ বিয়ের শাড়িটা আলোর ত্বকের সাথে খুব মানিয়ে গেল। সব কিছু আলমারীতে গুছিয়ে রেখে আলো তৈরী হল কাজে যাবার জন্য।

দরজায় পরাগ এসে দাঁড়াল, 'মা, বাবা কিন্তু একদম খেতে চাচ্ছে না।'

ব্যাপারটা গতকাল থেকেই লক্ষ্য করেছে আলো। মির্জা চলে যাওয়ার পর থেকে রাশেদকে খাওয়াতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। মুখ কিছুতেই খুলতে চাচ্ছে না। জোর করে চামচ দিয়ে মুখটা খুলে অল্প অল্প করে মুখে খাওয়া তুলে দিতে হচ্ছে। তাও গিলতে চাইছে না। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে। বেশী জোর করলে গলার ভেতর থেকে ঘরঘরে শব্দ করে ছটফট করে উঠছে। চোখদু'টো বড় বড় হয়ে মুখটা লাল হয়ে উঠছে।

'আজকে সকালে তো কিছুই খায়নি। আপা দুপুর বেলা কিছু খাওয়াতে পারে নি। স্কুল থেকে ফিরে আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।' পরাগ যোগ করল।

'দাঁড়া আমি হাসপাতালে যাই। কালকে সকালে কোনো জুনিয়র ডাক্তারকে নিয়ে আসবো। মনে হয় রাইলস টিউব দিতে হবে আবার।'

কি যে হল রাশেদের? সারাদিন ধরে ঘুমায়। রাইলস টিউব দিয়ে খাওয়ানো যাচ্ছে কিন্তু তা ছাড়া আর কোনো অভিব্যক্তিই নেই ওর মাঝে। আগে পরাগ পাশে বসে পত্রিকা পড়ে শোনাতো। রাশেদ কিছু বলতে পারতো না কিন্তু ওর চোখটা চকচক করে উঠতো। মনে হতো যেন ও খবরগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারছে। পারুল পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আরামে চোখদু'টো বুঁজে আসতো। আর আলো কাছে আসলে রাশেদের মুখটা প্রশান্তিতে নির্ভাজ হয়ে যেত। এখন সারাক্ষণ রাশেদ চোখ বুঁজে থাকে। আলো টের পায় রাশেদ হয়তো বা জেগে আছে কিন্তু চোখ খুলে না। যেন ও দেখতে চায় না পৃথিবীর রং-রূপ। ওর মুখের পেশীগুলো কাঠিন্যে স্তব্ধ হয়ে থাকে। যখন ঘুমিয়ে থাকে মাঝেমাঝে ছটফট করে ওঠে রাশেদ। গলা থেকে বেরিয়ে আসে ঘরঘরে গোঙানি। আলোর মনে হয় কোনো দুঃস্বপ্ন মন্থন করছে রাশেদের বোধ। ধীরে ধীরে এই বোধগুলোও যেন হারিয়ে যেতে থাকলো রাশেদের ভেতর থেকে। এখন ও শুধুই ঘুমায়। ও যেন চলে গেছে সমাধিতে। বাইরের কোনো আলোড়ন যেন ওকে আর স্পর্শ করছে না।

চিন্তা হয় আলোর। আবার চিন্তা করার বেশী সময়ও পায় না। পারুলের বিয়ের প্রস্তুতি আর সারা রাতের কাজ ওকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। তবু এর মাঝেও একবার ওর মনে হয় রাশেদকে একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। ওদের হাসপাতালে বসেন বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট ডা. রহমান। অনেক বলে-কয়ে একদিন ডা. রহমানকে বাড়িতে নিয়ে এল আলো। উনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন রাশেদকে।

তারপর বললেন, 'উনার রক্তচাপ আর ডায়াবেটিসতো মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে। কিন্তু কি জানেন আমার কাছে মনে হচ্ছে উনার মধ্যে থেকে বাঁচার ইচ্ছেটা চলে গেছে। এ ধরণের রোগী যারা প্রতিপার্শ্বের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে তারা সাধারণত অনেক ভালো থাকে। অনেকে মনের জোরেই আবার শরীরে বল ফিরে পায়। একটু আধটু নড়তে চড়তে পারে। অনেকে ধরে ধরে হাঁটতেও পারে। আশেপাশের মানুষের ভালোবাসা এই মনের জোরটুকু ধরে রাখতে সাহায্য করে। রোগীর ভেতর থেকে উপলব্ধি আসতে হবে যে বেঁচে থাকাটা মূল্যবান। পৃথিবীর রূপ-রং-রস-গন্ধ তাকে অনুভব করতে হবে। ভালোবাসতে হবে। উনি নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়েছেন। এ অবস্থায় কতদিন থাকবেন বলা মুশকিল। তবে আমার অভিজ্ঞতায় এ অবস্থায় চলে গেলে রোগী বেশীদিন বাঁচে না। আপনারা চেষ্টা করুন উনার সাথে যোগস্থাপনের। উনাকে গান শোনান, বই পড়ে শোনান, মাথায় হাত বুলিয়ে দিন, গালে আদর করুন। উনাকে বোঝাবার চেষ্টা করুন যে আপনারা ভালোবাসা নিয়ে উনার পাশে আছেন।'

ডাক্তারের কথা শুনে আলোর বুক ভেঙে কান্না আসে। রাশেদ আর বাঁচতে চায় না? ওর তো কিছুই নেই। একটা সম্পদই ছিল সম্ভ্রম। তাও বিকিয়ে দিয়েছে রাশেদকে বাঁচানোর তাগিদে। তারপরও রাশেদকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না আলো? ডাক্তার যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে কি রাশেদ ফিরে আসবে আবার জীবনময়তায়? যতক্ষণ বাড়িতে থাকে আলো রাশেদের পাশে বসে থাকে। গল্প করে। বিয়ের পরের গল্প। ছেলেমেয়েদের বড় হয়ে ওঠার গল্প। আলো বাড়িতে না থাকলে পরাগ-

পারুল পালা করে বাবার পাশে থাকে। আদরে-কথায়-গানে উজ্জীবিত করতে চায় বাবাকে। কিন্তু রাশেদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না।

পারুলের বিয়ের দিন এসে গেল এর মাঝে। বিয়ের শাড়ি পরে, নতুন গয়নায় সেজে ছবিভাবীর গাড়িতে করে পারুল গেল কাজি অফিসে। সাথে পরাগ। আলো বাড়িতে রয়ে গেল রাশেদের কাছে।

মেয়েকে সাজানোর আগে আলো বারবার নিষেধ করেছে, 'শোন একদম কাঁদবি না। কাঁদলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

কিন্তু তাকি আর মেয়ে শোনে? গাড়িতে ওঠার আগে হাউহাউ করে কেঁদেছে আলোকে জড়িয়ে। বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলে কাজি অফিস থেকেই পারুলকে রূপম নিজেদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। পরে ছবিভাবীর কাছে আলো শুনেছে খুব মানিয়েছে নাকি ওদের দু'জনকে।

পারুল চলে যেতে পরাগকে নিয়ে খুব একা লাগে আলোর। ছেলেটার ওপর চাপ আরো বেড়েছে। আগে রাতটা পারুল ঠেকা দিয়ে রাখতো। এখন পুরো দায়িত্বটা পড়েছে পরাগের ওপর। একটাই ভরসা রাশেদের কোনো চাহিদা নেই। দিনে দিনে ও যেন উদ্ভিদতর হয়ে যাচ্ছে। সারারাত পরাগ না উঠলেও কোনো সমস্যা নেই। দিন পার হয়ে যাচ্ছিল। আলোর কোনো চেষ্টাতেই রাশেদ ফিরে আসছিল না ওদের সাথে জীবন ভাগ করে নিতে।

একদিন সকাল বেলা পরাগ বলল, 'মা, বাবার পিঠে দেখ একটা ঘা হয়েছে।'

আলোর মুখ থেকে কোনো কথা সরলো না। হাসপাতালে কাজ করতে করতে ও তো জানে বেডসোর হয়ে যাওয়া মানে রোগীর শেষ সময়। নিয়মিত কাৎ বদল করে, পাউডার দিয়ে সে ঘা হয়তো বা সারানো সম্ভব। কিন্তু একবার বেডসোর হলে আবার হবে তারপর ক্রমাণ্বয়ে ঠেলে দেবে মৃত্যুর দিকে। পরাগকে নিয়ে রাশেদের কাৎটা বদলে দিল আলো। বেশী বড় হয় নি ঘাটা। মনে হয় ঠিকমত যত্ন নিলে সেরে আসবে। সেরে এলও। কিন্তু আবার কিছুদিন পর আরো একটা ঘা হল। এবার আরো বড় আরো দগদগে। এবার সারলো না। ছড়িয়ে যেত থাকলো সারা পিঠ, কোমর, উরু অব্দি। এক অদৃশ্য পতঙ্গ যেন চেটে খেয়ে নিতে থাকলো রাশেদের রক্ত-ত্বক-কোষ-জীবনশক্তি। এভাবে কয়েক মাস রইল রাশেদ। এক সন্ধ্যায় কাজে যাবার আগে রাশেদকে বিদায় জানাতে এসে হাত ধরল আলো। বরফশীতল সে হাত। আলো বুঝল যে হাত কুড়ি বছর আগে পরম উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরেছিল ওকে আজ তাতে আর রক্তপ্রবাহ নেই। রাশেদকে আর ধরে রাখতে পারলো না আলো। ভীষণ রাগ হল আলোর। মনে হল সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়। তারপর নিজের ব্যর্থতায়, অসহায়তায়, আত্মগ্লানিতে বুক ফেটে কান্না এল ওর। ও টের পেল ওর বেঁচে থাকার সবচেয়ে মূল্যবান প্রেরণাটা হারিয়ে ফেলল ও।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-৯

প্রায় দু' বছর হয়ে গেল জেলে আছে রতন। সীমান্ত এলাকায় নির্বাসিত জীবনযাপনের সময় থেকেই ওর মাঝে একটা পরিবর্তন আসছিল। নারী-নেশা ছেড়ে দিয়ে ও ধীরে ধীরে চারপাশের মানুষগুলোকে, তাদের সাথে সম্পর্কগুলোকে নতুন করে মূল্যায়ন করতে পারছিল। বুঝতে পারছিল কি রকম লক্ষ্যহীন হঠকারী জীবনযাপন করেছে এতদিন। কি অপমানকর অস্তিত্বের মধ্যে স্থান দিয়েছে সখিকে। সীমান্ত পার হওয়া মানুষগুলোর দুঃখময় জীবনকাহিনী ওর মাঝে আরো বেশী অপরাধবোধ জাগিয়েছে। মনে হয়েছে কত ভালোই না থাকতে পারতো ও জীবনে। নিজের হাতে ও নষ্ট করেছে সুখ, স্বস্তি, সংসার। একাকী জেলে বসে সেই বোধগুলো আরো বেশী করে রতনের মনে হতে থাকে। ওর জন্য কত যন্ত্রণার স্বীকার হয়েছে বড়ভাই। কি হাসিখুশী ছিল আর শেষবার যখন দেখা হল বড়ভাই যেন জীবনের ভারে বুড়ো হয়ে গেছে। রতন ভাবে জেল থেকে বের হলে এর প্রায়শ্চিত্ত করবে। সখিকে সম্মান দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবে। ছেলেমেয়েগুলোকে বাপের স্নেহে মানুষ করবে। ঢাকায় গিয়ে বড়ভাইয়ের কাছে মাফ চাইবে।

বিছানায় চুপ করে বসেছিল রতন। সীমান্তে সারাদিন একাকী ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকাটা যেন ওকে প্রস্তুত করে তুলেছিল জেলের একাকী জীবনের। খবর এল কে ওর সাথে দেখা করতে এসেছে। রতন দেখল রবি মোক্তার এসেছেন।

'অনেকগুলো খারাপ খবর আছে রতন মিয়া।'

রবি মোক্তার চাদর দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে বলেন। রতনের বুকের ভেতর ধ্বক করে উঠল।

রবি মোক্তার বললেন, 'মাস দু'য়েক হইল তুমার শ্বশুর দেহত্যাগ কইরেছেন। আমি কাজে গিয়েছিলেম উই গেরামে। ভাবলাম বৌমার সাতে ইকবার দেখা কইরে আসি। তখন খবর পেলাম। বাপ মারা যাওয়াতে খুব ভাইঙে পইড়ছে। তাছাড়া তুমার সম্বন্ধীও খুব ইকটা ভালো বেবহার কইরছে না। বুইলছে বৌমাকে শ্বশুরবাড়ি চইলে যেতে। মনে হয় বেশীদিন টিঁকতে পারবে না বৌমা উই বাড়িতে। কিন্তু বাড়ি ফিরে এলে সংসার কিভাবে চইলবে সেই ভয়ে বৌমা আইসতে চাইছে না।'

রতন বলে, 'রবিকাকা, ইখানে বইসে আমি আর কি বুইলব। সখিরে বাড়ি ফিরে আইসতে বলেন। জয়নাল আর শহীদ আছে উরা কিছু না কিছু ইকটা বেবস্থা কইরতে পাইরবে। সেই বাপের আমল থিকে তো ওরা আছে। কুনো অসুবিধে হবে নানে।'

'সে হবেক্ষণ। আর ইকটা খারাপ খবর আছে সেইটা যে আমি কিভাবে তুমারে বুলি?' আমতা আমতা করেন রবি মোক্তার।

তারপর বলেন, 'তুমার বড়ভাই রাশেদ মিয়া তো অনেকদিন বিছানায় ছিলেন। গত সপ্তাহে তার মৃত্যু হয়েছে। বড়বৌমা ডাকযোগে খবর পাঠাইছেন আমাকে। কি ভালো মানুষ ছিলেন! ভগবানের যে কি বিচার বোঝা বড় দায়।'

রবি মোক্তারের কথায় রতনের পৃথিবী টলে ওঠে। ও শুনেছিল ঢাকায় ফিরে গিয়ে বড়ভাইয়ের মাথার শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। বিছানা নিয়েছিল বড়ভাই। সে যে শেষ পর্যন্ত চলে যাবে তা রতন ভাবতেই পারে নি। ওর নির্বুদ্ধিতার মাশুল বড়ভাইকে দিতে হল জীবন দিয়ে? রতন আর নিজেকে সামাল দিতে

পারলো না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল জেল থেকে বের হলে জীবনের বিনিময়ে হলেও কিছু একটা করবেই ভাবী আর তার পরিবারের জন্য।

বাড়ির দাওয়ায় বসেছিল সখি। উঠোনে খেলছিল বাচ্চাগুলো। আজই বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে এসেছে সখি। বাপ মারা যাওয়ার পরদিন থেকেই ভাইভাবী ওকে তাড়ানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। গতকাল ভাবী বলেছে ও যদি নিজে থেকে না যায় তবে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। সংসার কি করে চালাতে হয় সখিতো জানে না। বিয়ের পর ও দেখেছে ঘরে সব মজুত আছে। কোনো কিছু নিয়ে কোনোদিন চিন্তা করতে হয়নি। এখন কি করে ও যোগাড়যন্ত্র করবে সবকিছুর? কি করে ভাত তুলে দেবে বাচ্চাদের মুখে? জয়নাল শহীদ বাড়ি ছিল না। বাড়িটা তালা মারা ছিল।

দুপুর নাগাদ জয়নাল বাড়ি ফিরে এল, 'ইকি মা জননী যে? কখুন এলেন?'

তড়িঘড়ি করে ঘরটা খুলে দিল জয়নাল।

গুড়-মুড়ি বের করে দিল খাবার জন্য, 'আর কিছু নেই ইখুন। আপনি আসবেন জাইনলে যুগারযন্তর কইরে রাইখতেম।'

ক্ষুধার্ত শিশুরা তাই খেল পেট ভরে। অনেকক্ষণ খেলাধূলা করে ওরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। পেটের শান্তি হতে ঘুমিয়ে পড়ল দাওয়ায় শুয়ে।

সখি বলল, 'জয়নালভাই, আমি তো থাইকবো ইখানে। সংসার চইলবে কি করে বুলেন তো? খাবার যুগান হবে কুথেকে?'

'তা নিয়ে চিন্তা কইরবেন না আপনি। আমি তো আছি। পুকুরের মাছ, ক্ষেতের সব্জিটুকু তো আছে। আর ধানীজমিটাতো এখন আবার ফিরে আইসছে আমাদের কাছে। গত কয়েক বছরে আমরা ধান তুলতে পারি নাই কিন্তু ইবার মনে হয় ধান কাটতে গেলে কেউ বাধা দেবে না। আর বাধা দেবেই বা কে? যারা দিতে পারতো তারাতো সব জেলে বইসে আছে। তবে কি জানেন মা জননী, আমরা তো কর্মচারী। মালিক না থাকলে আমরা আর কতটুকু কি কইরতে পারি। আপনি যদি ইকটু কথা বলেন গেরামের লোকজনের সাথে তা হইলে ওরা ইকটু ভরসা পাবে। ধান কাটায় যারা সাহাইয্য করে তারা ইখনো ভয়ে আছে। ইখনো বুইঝতে পাইরছে না জমিটা আসলে কার। আপনার কথা শুইনলে ওরা বুইঝবে জমি ইখনো আপনাদেরই আছে।'

সখির ভীষণ ভয় হয়। গ্রামের লোকজনের কাছে গিয়ে ডেকে ডেকে কথা বলতে হবে? এসব কি কখনো করেছে নাকি ও? চার দেয়ালের মধ্যে থেকে সন্তান বিয়ানো আর রান্না করা ছাড়া আর তো কোনদিনই কিছু করে নি ও। সখি চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকে। ওর মুখ দিয়ে কথা সরে না।

দিনের বেলাটা বড় অসহায় একাকী লাগে আলোর। কাজ থেকে ফিরে ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে আসতে চায় কিন্তু বিছানায় শুলেই কোথায় জানি ঘুমটা পালিয়ে যায়। অসংখ্য স্মৃতি প্লাবনের মতো এসে ওকে উন্মুলিত করে ফেলে। বিছানায় শুয়ে ও ছটফট করে। তন্দ্রা এলে মির্জার মুখটা কুকুরের শরীর নিয়ে ধেয়ে আসে ওর দিকে। লকলকে অশ্লীল গোলাপী জিহ্বা দিয়ে আলোর শরীরটা লেহন করতে থাকে। দুঃসহ বিবমিষা নিয়ে আলোর ঘুম ভাঙে। আলো ভাবে এ ভাবে চলতে থাকলে তো ও পাগল হয়ে যাবে। পারুল আসে মাঝে মাঝে। আলো টের পায় শ্বশুরবাড়িতে খুব ভালো আছে পারুল। স্বামীর সোহাগী বৌ। ঠিক যেমন বিয়ের পর আলো ছিল রাশেদের। পারুল আসলে আলোর মনটা ক্ষণিকের জন্য শান্তি পায় তারপর পারুল চলে গেলে আবার অশান্তিতে মন্থিত হতে থাকে।

দুপুরবেলা ঢুলছিল আলো। দরজা কড়া নাড়ার শব্দে ওর ঘোর ভাঙলো। এ সময় তো সাধারণত কেউ আসেনা।

দরজা খুলে দেখল এক বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, 'মা জননী আপনি আমারে চিনবেন না। আমার নাম রবি মোক্তার।'

নামটা শুনে চমকে ওঠে আলো। তারপর যত্ন করে ঘরে এনে বসায়।

'সারা রাত বাসে করে এসেছি। ঢাকা শহরটা ঠিকমত তো চিনিনে তাই বাড়ি খুইজে পেতে অনেক দেরী হইয়ে গেল।'

আলো ফ্যানটা বাড়িয়ে দেয়। এনে দেয় ঠান্ডা এক গ্লাশ লেবুর শরবত। রবি মোক্তার এক ঢোকে শেষ করে দিয়ে আরামের শ্বাস ফেলেন।

'আপনি কিছু খেয়েছেন দুপুরে?' আলো জিজ্ঞেস করে।

রবি মোক্তার ম্লান হেসে বলেন, 'নারে মা খাবার সুযোগ কইরে উঠতে পারিনি।'

পরাগের জন্য ভাত রান্না করা ছিল। রবি মোক্তারকে তাই বেড়ে দিল আলো। ভাত, ডাল আর মেনিমাছের ঝোল। পরাগের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে বাংলা ইংলিশ হয়ে গেছে। আজ সাধারণ গণিত। পরাগ আসলে ওকে রুটি বানিয়ে দেবে।

কাঠের টেবিলে বসে আরাম করে রসিয়ে রসিয়ে খেলেন রবি মোক্তার, 'আপনার রান্নার হাতটা কিন্তু বেশ। অনেকসময় পর এতো রসনা করে খেলাম।'

আলো হাসে।

খাওয়া শেষ হলে বাইরের ঘরে বসে রবি মোক্তার বলেন, 'ইবার বুলি কি কারণে আমার আসা আপনের কাছে। আমারে পাঠাইছে ছোট বৌমা। তবে রতন মিয়ারও এতে সায় আছে।'

রতনের নামটা শোনা মাত্র আলোর শরীরটা ঘৃণায় কুঁকড়ে ওঠে। রবি মোক্তার টের পান আলোর প্রতিক্রিয়া।

বলেন, 'আমি জানি আপনাদের যত দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী রতন মিয়া। কিন্তু কি জানেন সে ইখন অনেক বদলেইছে। আগের রতন মিয়া আর নেই। নিজের ভুল বুইঝতে পাইরেছে। বুলেছে জেল থেকে বের হইয়ে যে কইরেই হোক পায়শ্চিত্ত কইরবে।'

আলো দুঃখের হাসি হাসে, 'প্রায়শ্চিত্ত! কিসের প্রায়শ্চিত্ত রবিকাকা? যে মানুষটা চিরতরে চলে গেছে তাকে কি ও ফিরিয়ে দিতে পারবে?'

'জানি মা জননী রতন যা কইরেছে তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ছোট বৌমা আর তার সন্তানদের কথাও তো চিন্তা কইরতে হবে। রতন মিয়া জেলে। রাশেদ মিয়া ধরাধামে নাই। ই অবস্থায় জমির মালিক কিন্তু আপনারা দুই বৌ। ছোট বৌমা ভোলাভালা মানুষ। জমিজমার কোনো দেখভাল করা তারে দিয়ে হবেনানে। বাড়িতে জয়নাল আর শহীদ আছে কিন্তু মালিক ছাড়া কতটুকু আর কইরতে পারে কর্মচারীরা? কেউ যদি শক্ত হাতে হাল না ধরে তা হইলে জমিজমা আবার বেহাত হইয়ে যাইতে পারে। সেই সাথে ছোট বৌমা আর তার সন্তানেরা পথে বইসবে। আপনি যদি ইকবার গেরামে গিয়ে হাল ধরেন তা হইলে খুব ভালো হয়। আপনার সন্তানদেরও তো অধিকার আছে সেই জমি ভোগদখলের। তারা কেনো শুধু শুধু বঞ্চিত হবে?'

'এই জমির জন্য অকারণে রাশেদ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আর সেই জমির দেখভাল করতে যেতে হবে আমাকে? এটা আপনি কি করে বললেন রবি কাকা?' আলো আর্ত চিৎকার করে ওঠে।

'মারে আমি তো ওকালতি করি। জীবনটা আমার কাছে সাদাকালো না। বেশীরভাগটাই ছাই রং। আমাদের আপোষ করতে হয়। সমঝোতা করতে হয়। অনেককাজ মনে না চাইলেও করতে হয়। যে কাজটা আপনাকে কইরতে বুলছি তা আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব না। আপনি আমার কথা ভেইবে দেখেন। পরাগের পরীক্ষা শেষ হইলে তো অনেকদিন ছুটি থাকবে তখুন আপনি কিছুদিন গেরামে ঘুইরে যান। দেইখবেন খারাপ লাইগবে না।'

সেদিন রাতটা রবি মোক্তার থেকে গেলেন। বারবার বিভিন্নভাবে বোঝালেন আলোকে। পরাগ যখন শুনতে পেল পরীক্ষার পর গ্রামে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে তখন ও-ও নেচে উঠল। আলোর মনটা নরম হয়ে এল সবশেষে।

ভোরে যাবার আগে রবি মোক্তার বললেন, 'আপনি কিন্তু আমারে কথা দিয়েছেন মা জননী। পরাগ বাবাজীর পরীক্ষা শেষ হইলে আপনি কিন্তু নিশ্চয় আসবেন। আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকবো।'

আলো নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। কিছু বলে না।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-১০

ফেরীর রেলিং-এ হেলান দিয়ে পরাগ নদীর বাতাস গায়ে বুলাচ্ছিল। মাঝ রাত। আকাশে বিশাল একটা চাঁদ হাসিমুখে দিগন্তজুড়ে আলো ছড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নার রং গায়ে মেখে নদীর ঢেউগুলো তরল রূপার মতো আছড়ে পড়ছে ফেরীর গায়ে। বাতাসের দিকে মুখ দিয়ে পরাগ চোখ বন্ধ করে দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল। যেন ধরিত্রীর পঙ্কিল বন্ধন ছিঁড়ে আকাশের নির্মলতায় উড়ে যেতে চাইছে ও। মা ঘুমিয়ে আছে বাসের ভেতর। পরাগ বাস থেকে নেমে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফেরীর এ মাথা থেকে ও মাথা। অনেক অনেক দিন পর কোথাও যাচ্ছে পরাগ। হিসেব করে বলতে পারে প্রায় সাত বছর হল ও বন্দী হয়েছিল লালবাগ রোডের ওপর ওদের তিন কামরার বাসাটায়। মামলা শুরু হল। বাবা অসুস্থ হল। তারপর তো বাবা চলেই গেল। বাবা নেই। বুকের ভেতরটা যে কি ভীষণ খালি লাগে পরাগের! কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয় না। সবাই বলে ও নাকি বাবার মতো হয়েছে। শান্ত, ঠান্ডা। রাগে না, মাথা গরম করে না, কাঁদে না। কিন্তু পরাগ নিজে তো জানে ওর ভেতরে ভেতরে কি হয়। গত বেশ কয়েক বছর ও আর মা যেন এই পরিবারের দু'টো স্তম্ভ হয়ে আছে। পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত দায়ভার কাঁধে নিয়ে ওরা ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দারিদ্র, একের পর এক দুর্ঘটনা ওকে পরিণত করে তুলেছে খুব অল্প বয়সেই। ও বুঝেছে প্রকৃতির সাথে বিবাদ করা চলে না। যা ঘটছে তা মেনে নিয়ে জীবনের পথ চলতে হয়। মাঝে মাঝে যখন প্রতিনিয়ত এই কষ্টকর জীবন ওর আর সহ্য হয় না পরাগ হেঁটে হেঁটে চলে যায় লালবাগ বাজারের পেছনে বুড়িগঙ্গা নদীর ঘাটে। এই ঘাটের মাঝির ছেলে পরাণ ওর ক্লাসে পড়ে। পরাণ নৌকা বায় আর পরাগ চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে। বৈঠার আঘাতে নদীর জল ছলকে ছলকে ওর গায়ে এসে লাগে। নদীর কলকল ধ্বনি ওর কানে সুর হয়ে বাজে। সব ভুলে মনটা প্রশান্ত হয়ে ওঠে। পরাণ মাঝে মাঝে নদী পার করে ওকে নিয়ে যায় জিঞ্জিরায়। ওখানে একটা ভাঙা কালীবাড়ি আছে। কেউ যত্ন করে না। পরাগ আর পরাণ মিলে কালীবাড়ির গোলকধাঁধায় লুকোচুরি খেলে। মনের ভেতরে জমে থাকা দুঃখ, ক্ষোভ সব কোথায় জানি চলে যায়। পরাগ খোলা মন নিয়ে আবার সংসারের কর্মকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মনে হয় ভালোই হয়েছে। মা বলেছে ফল বের না হওয়ার আগ পর্যন্ত হয়তো ওরা গ্রামে থাকতে পারবে। শুনে কি যে আনন্দ হয়েছিল পরাগের। গ্রামের খোলা আকাশ ওকে ভীষণ টানে। আকাশে যে এত রকম মেঘ থাকে তা গ্রামে না গেলে পরে কি কোনোদিন জানতে পারতো? ফেরীটা প্রায় ঘাটে চলে এসেছিল। পরাগ বাসে উঠে এল। মা এখনো ঘুমিয়ে আছে। মাকে দেখলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। মা এখনো খুব সুন্দর আছে কিন্তু দেখলে বোঝা যায় মা ভীষণ ক্লান্ত। চোখের নীচের কালি স্থায়ী আসন দখল করেছে। কপালে, চোখের কোণে গভীর হয়ে ভাঁজ পড়েছে। মার ঘন কালো চুলের গোছায় ভেসে উঠেছে রূপালী চুল। বাবা কত আদরে রেখেছিল মাকে! সেই মা এখন সারারাত জেগে রোগীর সেবা করে। মার কাঁধে মাথা দিয়ে পরাগ চোখ বুঁজে থাকে। বাসের ড্রাইভার পুরোনো আমলের লোক। সারা রাস্তা ধরে বেজে চলেছে পুরোনো বাংলা গানের ক্যাসেট। এখনো বাজছে প্রতিমার গান, 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই'। গানের সুর মননে অনুরণিত হতে হতে ঘুম নেমে আসে পরাগের চোখে।

'মহিপুর, মহিপুর' ডাকে ঘুম ভাঙে পরাগের।

কন্ডাক্টরকে বলা ছিল বাজারের কাছে ওদের নামিয়ে দিতে। তা নাহলে আবার শহর পর্যন্ত গিয়ে ফিরতি বাস ধরে গ্রামে ফিরতে হবে। মাকে ডাক দিল পরাগ। বাসের গহ্বর থেকে বের করে নিল ব্যাগ আর স্যুটকেস। ওরা ছাড়া আর কেউ এখানে নামে নি। ভোর হতে এখনো বেশ খানিকটা সময় বাকী।

পরাগ বলে, 'মা কি করবে এখন?'

'যতদূর মনে পড়ে এই বাজারের পেছনেই ঘাট। নৌকা করে নদী পার হয়ে তারপর বাড়ি যেতে হয়। এ সময় কি কোনো নৌকা পাওয়া যাবে নাকি?'

পরাগ হেঁটে ঘুরে দেখে। পেছনে সত্যিই একটা ঘাট আছে কিন্তু কেউ নেই সেখানে।

আলো বলে, 'চল, এখানেই বসে থাকি। যখন ফরসা হবে তখন নিশ্চয়ই কাউকে পাওয়া যাবে।'

মিলন ফার্মেসীর সাইনবোর্ডের ওপরে একটা হলুদ বাতি মিটমিট করে জ্বলছিল। ফার্মেসীর বাইরে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল মাটির সাথে গজাল দিয়ে আটকানো। পরাগ আর আলো সেখানে এসে বসল।

ঝিমুনি এসে গিয়েছিল ওদের।

হঠাৎ ডাক শুনলো, 'শান্তিপুর যাবার যাত্রি আছেন নাকি কেউ?'

পরাগ উঠে দেখল ঘাটে নৌকা এসেছে। এখনো সূর্য ওঠে নি কিন্তু একটু একটু করে ফর্সা হয়ে আসছে চারপাশ। ওদের দেখে একগাল হাসল মাঝি।

'তা কার বাড়ি যাবেন আপনারা?'

'রহিম মিয়ার বাড়ি।' পরাগ ওর দাদার নাম বলে।

'রহিম মিয়া? তিনি তো গত হইয়েছেন সেই কবে? তা আপনারা কি হন তার?'

'আমার দাদা। আমার বাবার নাম রাশেদ মিয়া। আর এই আমার মা।'

'রাশেদ মিয়া? চিনি তারে। ছোটবেলায় আমরা খেলতাম একসাতে। কি সব হইয়ে গেল যে? রতন মিয়া জেলে। রাশেদ মিয়া তো শুনলাম আর নেই। বাড়িতে মনে হয় রতন মিয়ার পরিবার আছে।' নৌকা বাইতে বাইতে বলে মাঝি।

মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। চুপ করে শোনে। কিছু বলে না। মাঝিও কোনো উত্তর না পেয়ে চুপ করে যায়।

ঘাটে ভিড়লে বলে, 'আপনারা বাড়ি চেনেন কি?'

পরাগ মাথা নাড়ে।

'আমার সাথে চলেন। আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

মাঝির সাথে সাথে ওরা মেঠো পথ ধরে বাড়ি আসে। গ্রামটা সবে জেগে উঠছে আস্তে আস্তে। যারা ক্ষেতে কাজ করে তারা বেড়িয়ে পড়েছে কাজের তাগিদে। ছোট ছেলেমেয়েগুলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে উঠোনে উঠোনে।

পথে কারো সাথে দেখা হলে বলে, 'কে যায়?'

মাঝি জবাব দেয়, 'রহিম মিয়ার নাতি।'

সবাই ঘুরে ঘুরে দেখে ওদেরকে তবে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

ওদের বাড়ির লোকজনও সবে জাগতে শুরু করেছে। জয়নাল আর শহীদ উঠোনে বসে মুখ প্রক্ষালণ করছে। সখি আর তার সন্তানেরা তখনো ওঠে নি।

মাঝি বলে, 'এই দেখো কে এইসেছেন তুমাদের বাড়ি। রাশেদ মিয়ার পরিবার।'

কথা শুনেই ত্রস্ত হয়ে ওঠে জয়নাল, 'আসেন আসেন মা জননী। এই শহীদ মোড়া নিয়ে আয়। বইসতে দে।'

মোড়া নিয়ে আসার অপেক্ষা করতে পারে না পরাগ। দাওয়ায় একটা চাটাই পাতা ছিল তাতেই বসে পড়ে। ক্লান্তিতে চোখটা বুঁজে আসছে।

জয়নাল বোঝে, 'সারারাত ধইরে বাসে করে এইসেছেন। খুব ক্লাইন্ত লাগছে না? দাঁড়ান ছোট মারে ডাকি। আপনাদের থাকার ঘরদোর তো গুছিয়ে দিতে হবে।'

বাইরের কথাবার্তায় ঘুম থেকে উঠে সখি বাইরে বেরিয়ে আসে। চোখে তখনো আধোঘুম। প্রথমে আলোকে চিনতে পারে না সখি। কতদিন দেখা নেই। তারপর জয়নাল বলতে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে আলোকে। চোখ থেকে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আলোর কাঁধে।

সারা সকাল ঘুমিয়ে দুপুর নাগাদ জাগে পরাগ। বিশাল পালঙ্কের ওপর শুয়ে ছিল ও। এটা নাকি ওর দাদার বিছানা ছিল। পরাগ জানালা দিয়ে আকাশ দেখে। ধবধবে সাদা পালকের মতো পলকা এক টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। চারপাশে কোনো শব্দ নেই। একটা পাখি মিষ্টি সুরে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। ভীষণ ভালো লাগে পরাগের। পড়ার চিন্তা নেই। প্রতিদিনের টানাপোড়েনের শ্রান্তি নেই। মুক্ত বিহঙ্গের মতো মনে হয় নিজেকে। বাইরে বেড়িয়ে আসে পরাগ। রান্নাঘরের সামনে মা আর চাচী বসে গল্প করছে। মার কোলে ঘুমিয়ে আছে ছোট চাচাত বোনটা। বড় দু'জন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সামনের বছর থেকে ও-ও যাওয়া শুরু করবে।

চাচী বলে, 'কি ঘুম ভাঙল? যাউ মুখ ধুইয়ে আস আমি খাবার যুগার কইরছি।'

পরাগ এসে মার পাশে বসে। মা হাত বুলিয়ে দেয় পরাগের চুলে। মাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে আজকে। প্রশান্ত, উদ্বেগহীন। মার এরকম চেহারা কতদিন দেখেনি পরাগ!

চাচী বলে, 'পায়েলরে নীচে শুইয়ে দেন আপা। পরাগের সাতে আপনিও খেইয়ে নেন। আসার পর থেইকে তো কিছু মুখেই তুললেন না।'

ওরা তিনজন খেতে বসে। ভাত, লাল শাক, কলাইয়ের ডাল আর বেগুনভর্তা।

'বাড়িতে আর কিছু নেইকো। ইকটু কষ্ট করে খাওগো বাবা।' চাচী ম্লান মুখে বলে।

পরাগ হাসে। এর চেয়েও কত স্বল্প আয়োজন দিয়ে দিনের পর দিন ওরা ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে। মুখে বলে, 'ভীষণ ভালো হয়েছে। কতদিন পর লালশাক খেলাম।'

চাচীর মুখ থেকে ছায়াটা কেটে যায়, বলে, 'জয়নালকে বুইলব পুকুরে জাল ফেলতে। যদি কিছু মাছ ধরা পরে। না হইলে বিকেলে বাজারে পাঠাবোনে।'

ওরা খাওয়া শেষ করতে করতে পুনম আর ফরিদ স্কুল থেকে ফিরে আসে। গ্রামের স্কুল। দু'টো নাগাদ ছুটি হয়ে যায়। পুনমের বয়স দশ। ক্লাশ ফোরে পড়ে। ফরিদ ক্লাশ টুতে। ওরা এসেই গোগ্রাসে ভাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারপর পরাগকে বলে, 'ভাইজান চল তুমারে গেরামটা দেখিয়ে আনি।'

ওদের সাথে বেরিয়ে পড়ে পরাগ। আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায় দৌড়ে বেড়ায়। বাতাসে গাছের পাতার দুলুনীতে সরসর শব্দ হয়। কি যে ভীষণ ভালো লাগে। পুনম আর ফরিদ খুঁজে খুঁজে দেখে কোথাও কোনো আম পড়ে আছে কিনা। ওদের ওপর কড়া নিষেধ আছে গাছ থেকে আম পাড়ার। একটা আম খুঁজে পায় ফরিদ। টকটকে সবুজ কাঁচা।

পুনম বলে, 'বাড়ি নিয়ে গিয়ে মাকে বুইলব মাইখে দিতে।'

মাচানের ওপর এসে বসে পরাগ। আরামঠান্ডা হয়ে আছে বাগানের ভেতরটা। অদ্ভুত ভালোলাগায় মনটা ভরে যাচ্ছে। বেশকিছুদিন হল পরাগ কবিতা লেখা শুরু করেছে। মাথার ভেতরে কিছু বাক্য ঘুরে ঘুরে আসছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে না। পরাগ ভাবে কাগজ-কলম সাথে নিয়ে আসতে হবে এর পর।

মেঘ করে আসছিল।

পুনম বলল, 'বৃষ্টি হবে বইলে বুধ হইছেছ। চল বাড়ি ফিরে যাই।'

পরাগের আর একটু ঘোরার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল ঘন কালো মেঘ ঈশান কোণ থেকে ঘনিয়ে আসছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রবল বর্ষণ শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বাড়ি এসে পরাগ দেখে রবি মোক্তার বসে আছে দাওয়ায়, 'তা বাবাজী, কেমন লাইগছে আমাদের এই গেরাম?'

পরাগ হাসিমুখে বলে, 'ভীষণ ভীষণ ভালো।'

রবি মোক্তার হেসে ফেলেন, 'বেশ বেশ।'

তারপর মার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মা জননী আপনি যে আইসছেন কি যে খুশী হয়েছি আমি। আপনারে কিছু কথা বলি ইকটু মন দিয়ে শুনেন। মামলা শেষ হইয়ে যাওয়ার পর এই বাড়ির দলিলটা আপনাদের উকিল হিসেবে আমার কাছে জিম্মে রাখা আছে। শহরে এক ম্যাজিস্ট্রেট আছেন আমার চেনাজানা তার কাছে আমি গচ্ছিত রেইখেছি। আদালতের জজ সাহেবও জানেন সেই কথা। দলিলটা আমি আপনারে এনে দিব। আপনি গেরামের লোকজনরে একসময় বাড়িতে ডাকেন। জয়নাল বেবস্থা কইরতে পারবে। তাদের সামনে দলিলটা দেখিয়ে বুলেন যে আপনি জমির মালিক। জমির দেখভাল করার জন্যি আপনার লোক দরকার। আপনারে দেইখলে পরে তারা ভরসা পাবে।'

পরাগ শুনে হাসে, 'মা মনে হচ্ছে তুমি যেন রাণী। দরবার বসাবে। তোমার প্রজারা আসবে। তুমি তাদের আদেশ দেবে।'

রবি মোক্তার বলেন, 'বেপারটা কিন্তু অনেকখানি তাই। আরেকটা কথা বলি। শুনতে আপনার হয়তো ভালো লাইগবে নানে কিন্তু মন না চাইলেও আপনারে এই কাজটা কইরতে হবে। জেলে গিয়ে রতন মিয়ার সাতে আপনি একবার দেখ করেন। সে বুইলতে পারবে কাকে বিশ্বাস করা যায়। কাকে দিয়ে কি কাজ কইরতে পাইরবেন। একবার যখন চইলে আইসছেন তখন কাজটা যেন ঠিকমত হয় সেই দিকে নজর দিতে হবে।'

আলোর খুব কষ্ট হয়। ওই পাষন্ড রতনের সাথে গিয়ে ওকে দেখা করতে হবে? ওর মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে। সখি বোঝে আলোর কষ্টটা।

আলোর পাশে এসে ওর পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আপা আমি আমার স্বামীর হইয়ে আপনার কাছে মাফ চাইছি। মানুষটা কিন্তু অনেক বদলেইছে ইর মধ্যে। আমি জেলে গেলে সব সময় নিজের দোষের কথা স্বীকার করে। মাফ চায়।'

আলো সখিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, 'যাবো আমি। তুমি চিন্তা করো না।'

রতনের চেহারাটা মনে ছিল না আলোর। কতদিন দেখে নি ওকে! রতনকে দেখে বেশ অবাক হল আলো। শরীর থেকে বাড়তি মেদ ঝরে গেছে রতনের। জেলে কায়িক পরিশ্রমের সাথে সাথে নিয়মিত ব্যায়াম করা শুরু করেছে ও। বেশ পেটানো স্বাস্থ্য হয়েছে ওর। আলো দেখে রাশেদের মুখের সাথে হাল্কা মিল যেন আছে রতনের।

'ভাবী আপনি আইসছেন! আমি স্বপ্নেও ভাবিনিকো আমার অপরাধ ক্ষমা কইরে আপনি আসতে পারেন। আপনি কত বড় ভাবী।'

আলোর ভেতর থেকে কাঠিন্যটুকু গলে না, বলে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে আসিনি। আমি এসেছি সখি আর তার সন্তানের মুখ চেয়ে। তোমার সাথে আমার দেনা-পাওনা কিন্তু এখনো মেটেনি।'

রতন মুখ নীচু করে শোনে, বলে, 'ভাবী আমি বাহির হই, দেইখবেন আমি চিরদিন আপনার খেদমত কইরব।'

'এসব কথা থাক। রবিকাকা তোমার সাথে দেখা করতে বলেছেন। তুমি কিছু বলতে চাও?'

'জি। আপনারে কিছু জরুরী কথা বলি। মামলা-মোকদ্দমা হইয়ে আমাদের তো ইখুন অনেক শত্তুর। তাদের বেশীরভাগই ইখুন জেলে। কিন্তু কিছুদিনের মইধ্যে তারা বাহির হবে। আবার হয়তোবা জট পাকাবে। তাদের আপনাকে চিনে রাইখতে হবে। আমার এক বন্ধু আছে মহি। তার কাছ থেইকে আপনি দূরে থাইকবেন। আমি ইখনো বুইঝে উঠতে পারিনে সে আমার বন্ধু না শত্তুর। সে আমারে জানে বাচিয়েছিল আবার সেই শফিক মিয়ারে আমার কাছে নিয়ে আইসেছিল। সে কোনো পরামর্শ দিলে কানে তুইলবেন না। কিছুদিন পর জেল থিকে বের হবে আতর আলীর চাচাত ভাই মঈনুদ্দীন। সে বাহির হইলে তাকে দিয়ে আমিন মাতব্বর নতুন কোনো খেলা খেলতে পারে। তার কাছ থিকেও সাবধান থাকবেন। তবে কি জানেন গেরামের বেশীরভাগ মানুষই সাদাসিধে, ভালোমানুষ। তাদেরকে নিয়ে আপনার ভয়ের কিছু নেই। হাতেগোনা কিছু কালসাপ আছে তাদেরকে চিনে রাইখলে কোনো সমস্যা হবে নানে।'

আলো চুপ করে মন দিয়ে শোনে, 'আর কিছু বলবে?'

'না। আর কি বুইলব? আপনাদের কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই। আর যে কিছু বুইলব সেই মুখ কি আমার আছে?'

আলো আর দাঁড়ায় না। এতক্ষণ ধরে রতনের সাথে কথা বলেছে তা চিন্তা করেই গাটা ঘিনঘিন করে ওঠে। বাইরে রবি মোক্তার অপেক্ষা করেছিলেন।

আলো বের হতে বললেন, 'আপনারে ইকজন মানুষকে চিনিয়ে রাখি মা জননী। উই যে দূরে গাছতলায় দাড়িয়ে বিড়ি ফুকছে উর নাম মহি। রতনমিয়ার পরানের বন্ধু। তবে বন্ধু না শত্তুর কে জানে। উ এখুন জেল খানার সামনে ঘুরঘুর কইরছে বেপারটা আমার ভালো লাইগছে না। নিশ্চয় কুনো মতলব আছে। উর কাছ থিকে দূরে দূরে থাইকবেন। আর আপনি কুখনো একা একা কুথাও যাবেন না। সাতে পরাগ বাবাজী অথবা জয়নালরে নিবেন।'

মহির সামনে দিয়েই হেঁটে যেতে হয় আলোকে। ওর দিকে তাকিয়ে মহি আদাব দেয় তারপর দাঁত বের করে হাসে। হলুদ ঘিনঘিনে দাঁত। এত কুৎসিৎ হাসি এর আগে কাউকে হাসতে দেখেনি আলো। না দেখেছে। মির্জার কথা মনে পড়ে যায় আলোর। ওর তলপেট থেকে দু'টো পা অবশ হয়ে আসে। ও কি ঠিক করছে? এই গ্রামে এসে কি আবার কোনো দুর্ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়বে ও? আলোর বুকটা অনেকদিন পর ভয়ে হিম হয়ে ওঠে।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-১১

পেয়ারাগাছের হেলানো ডালের উপর শুয়েছিল পরাগ। সকাল গড়িয়ে দুপুর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাতার ছায়া ওকে রক্ষা করছে সূর্যের প্রখর চাহনি থেকে। মাঝে মাঝে পাতার ছাউনি গলে এক চিলতে রোদ ঢুকে চমক দিচ্ছে ওর চোখের পাতায়। পরাগ নতুন ছায়ায় মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছে। ছোটছোট এই পেয়ারাগুলো। ভিতরটা লাল। কিন্তু ভীষণ মিষ্টি। পরাগের গালের কাছ ছুঁয়ে আছে এক গুচ্ছ ফল। পরাগ একটু একটু করে কামড় দিচ্ছে আর ভাবছে। এ রকম অলস সময় জীবন প্রথম কাটাচ্ছে পরাগ। দিনের পর দিন। কোনো কাজ নেই। কোনো চিন্তা নেই। লিখতে লিখতে কবিতার খাতাটা ভরাট হয়ে আসছে। বুকের ভেতরে যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা সব প্রাণ পায় ওর কবিতার পাতায় এসে। যে অনুভূতিগুলোকে ও কাউকে বলতে পারে না তা বোধের গহন থেকে উগরে আসে কবিতা হয়ে। পরাগের কবিতাগুলো পড়লে কারো বিশ্বাসই হবে না এই শান্ত, ধীরস্থির, নম্র কিশোরের ভেতর পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এত ক্ষোভ, এত বঞ্চনা। এত প্রগাঢ় দুঃখবোধ মন্থন করছে ওর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ। পরাগ বোঝে এই কবিতাগুলোর মধ্যে দিয়েই ও নিজেকে হাল্কা করতে পারে। সব মালিন্য সব উন্মাদনা মন থেকে মুছে ফেলে স্থিতিশীল থাকতে পারে।

বাগানটা বাড়ির লাগোয়া। হরেকরকম গাছ আছে। ফলের গাছ। কোনো যত্ন না নিলেও প্রকৃতির আশীর্বাদে প্রতি বছর মুখর হয়ে থাকে ফলের সমাহারে। জয়নালচাচা বলেছে এর অনেকগুলো গাছই নাকি বাবার লাগানো। এই পেয়ারাগাছটা নাকি বাবার প্রথম লাগানো চারা। এই গাছটাকে তাই পরাগের সবচেয়ে ভালো লাগে। একটা ফুলের বাগানও ছিল। আগে নাকি দাদী আর চাচী যত্ন করত। গত কয়েক বছরের অযত্নে তা জংলা ঝোপে পরিণত হয়েছে। কিছু বাক্য ঘোরাঘোরি করছিল পরাগের বোধে

যত দিন যায়
অশ্লীল শৃঙ্খল শুধু
পায়ে বেড়ি বাঁধে
নগরীর রাজপথে বাতাসের দারুণ অভাব

যত দিন যায়
ছবিগুলো ধূসর মলিন
গানগুলো হয়ে ওঠে বিধুর-বেহাগ

যত দিন যায়
অশান্ত কোলাহলে নৈঃশব্দ্য টুকরো হয়ে যায়
গৈরিক বর্ণরসে দু'নয়নে ঘোর লেগে থাকে

পা ভাঁজ করে খাতাটা হাঁটুর ওপর রেখে পরাগ লিখছিল। হঠাৎ ওর দৃষ্টিসীমায় লাল রঙের আলোড়ন ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। বাগানের সীমানার পর থেকে শুরু ওদের পাশের বাড়ির আঙিনা। ছোট ছোট

গাছের ডাল দিয়ে কোনো সময় একটা বেড়া তৈরী করা হয়েছিল। এখন তার বেশীরভাগই ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। পাশের বাড়ি থেকে খুব সহজেই ঢুকে পড়া যায় ওদের বাগানে। লাল ওড়নায় ঢাকা একটা মেয়ে চুপি চুপি এসে ঢুকেছে। গাছের ওপর শুয়ে থাকা পরাগকে দেখেনি ও। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা তারপর তরতর করে উঠে গেল জামগাছে। সাথে করে একটা পলিব্যাগ নিয়ে এসেছে। তাতে দ্রুতগতিতে ভরে নিচ্ছে নধর টসটসে কালোজাম। পরাগ শুয়ে শুয়ে তামাশা দেখছিল। বেশ মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর ওর ঘন বিনুনী সাপের মতো দুলে বেড়াচ্ছে সারা পিঠ জুড়ে। খালি পায়ে আলতার রাঙা দাগ। অনেকদিন পর আলতারাঙা পা দেখল পরাগ। ছোটবেলায় মা দিত। ব্যাগটা প্রায় ভরে এসেছিল মেয়েটার। নামার প্রস্তুতি নিতে উল্টো দিকে ঘুরে তাকাতে ওর চোখ পড়ে গেল পরাগের ওপর। মেয়েটা চমকে গেল। বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখ। মুখটা বিশাল হা হয়ে গেল। যেন ভূত দেখেছে। হাত থেকে ব্যাগটা খসে পড়ল। পাটা ডালের ওপর থেকে পিছলে যেতে নীচের দিকে পড়ে যেতে থাকলো মেয়েটা। ভাগ্যিস অন্য হাত দিয়ে মোটা একটা ডাল ধরা ছিল তাই ধরে ঝুলতে থাকলো শূন্যে। পরাগ চিৎকার করে বলল, 'ভয় পেও না। আমি কিছু বলব না। দাঁড়াও আমি আসছি।'

পেয়ারা গাছ থেকে পরাগ নেমে আসতে আসতে মেয়েটা ততক্ষণে নিজের ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে। পা খুঁজে পেয়েছে ডালের আশ্রয়। ও নেমে এল আস্তে আস্তে। কুড়িয়ে নিল জামের ব্যাগটা। উপর থেকে পড়ে অনেকগুলো জামই থেঁতলে গেছে। ততক্ষণে পরাগ পৌঁছে গেছে জামগাছের নীচে।

পরাগকে দেখেই মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'ইভাবে কাউরে ভয় দেখাতে হয়? হা ভগবান আমার বুকটা ইখনো ধরফর কইরছে। এই তুমি কে? ইখানে কি কইরছ?'

'আমার নাম পরাগ। রহিম মিয়া ছিলেন না? আমি তার নাতি। তুমি কে?'

পরাগের পরিচয় শুনে মেয়েটা দাঁত দিয়ে জিভ কাটে, 'আপনি বাগানের মালিক? আমারে ক্ষমা কইরে দেন। বাড়িতে কতদিন কেউ থাকে না। বাগানের ফল তো খায় না কেউ। বাদুড়ে কাটে। পাখি ঠুকরায়। গেরামের ছেলেপেলে এইসে পেইড়ে নিয়ে যায়। আমি এইযে জাম পেইড়েছি সরষের তেল আর কাঁচা নঙ্কা দিয়ে মজা কইরে মাইখবো নে। আপনি খাবেন?'

পরাগ বোঝে চুরি ধরার পর মেয়েটা ওকে ঘুষ দিতে চাইছে।

ও হেসে বলে, 'আমাকে আপনি বলতে হবে না। তুমি বল। জামমাখা খেতে আমারও খুব ভালো লাগে। আমাকে একটু দিও। তোমার নাম কিন্তু এখনো বললে না।'

'হা রাম! নাম আমার রাধারাণী। সবাই ডাকে রাধু। তুমি বইসো আমি জামমাখা নিয়ে আইসি।'

ভাঙা বেড়া ডিঙিয়ে রাধু দৌড়ে চলে গেল পাশের বাড়িতে। পরাগ ফিরে এল পেয়ারাগাছের ওপর ওর জায়গায়। রাধুকে দেখার পর ওর মনে অন্যরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। কিছু শব্দ আনাগোনা করছে মনে কিন্তু বাক্যের রূপ পাচ্ছে না। এই অনুভূতিটা নতুন। এ নিয়ে কোনোদিন কিছু লেখেনি পরাগ। মনের মাঝে এই নতুন বোধটাকে আকার দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে পরাগ। খাতা খুলে কিছু লেখার আগেই রাধু এলুমিনিয়ামের একটা বাটি ভরে জামমাখা নিয়ে আসে।

পরাগ রাধুকে বলে, 'উঠে এসো। গাছের উপর বসে খাই।'

'ই বাটি নিয়ে আমি উঠব কি করে? বরং তুমি নীচে নাইমে আস। জামরুল গাছটার নীচে ইকটা মাচান আছে উইখানে বইসে খাওয়া যাবে।'

পরাগ নেমে আসে। মাচানের উপর বসে ওরা দু'জন।

রাধু বুদ্ধি করে দু'টো চামচ নিয়ে এসেছে, 'জামের যা দাগ হাত দিয়ে খেলে ইকদম বেগুনী রং হইয়ে যাবে।'

পরাগ মুখে দিতেই মনে হল জ্বলন্ত মশাল যেন ওর মুখে গুঁজে দিয়েছে কেউ। এত ঝাল কোনো কিছু হতে পারে? কয়শো টা লঙ্কা দিয়েছে রাধু? ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরে। মুখ হাঁ করে 'উঃ আঃ' করতে করতে চোখ মুছতে থাকে।

পরাগের অবস্থা দেখে হেসে গড়িয়ে পরে রাধু, 'ইটুকু ঝাল সইহ্য করতে পারোনা? আর পাইরবাইবা কেমনে? তুমরা তো শহরের মানুষ।'

পরাগ জবাব দেয় না। ঝাল হলেও জামের রস আর সর্ষের তেলের ঝাঁঝে মাখাটা অসাধারণ হয়েছে। ঝালের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে অল্প অল্প করে রসিয়ে রসিয়ে খেতে পারে ও।

ওর খাওয়া দেখে রাধু হাসে, 'এইতো বাবু খেতে শিখে গেছে। প্রথম তুমার অবস্থা দেইখে আমি যা ভয় পেইয়েছিলেম না।'

'স্কুলে যাও তুমি?' পরাগ জিজ্ঞেস করে।

'না এখুন আর যাই না। গত বছর আট ক্লাশ শেষ করলাম। মা বুইলল আর পইড়ে কি হবে? তার চেইয়ে ঘরের কাইজ শিখ। আর কিছুদিন পর তো তো বিয়ের যুগার কইরতে হবি নে। তো আমি ঘরে বইসে আছি। মার কাছ থিকে রান্না শিখছি, সেলাই শিখছি। ইসব কইরে কি আর সময় কাটে? তো আমি ইকটু পাড়া বেড়াই। তা নিয়ে মা আমারে সকাল-বিকেল বকে। আইচ্ছা বুল, আমার কি বিয়ের বয়স হইয়েছে? আমারে আর ইকটু পড়তে দিলে কি হত?'

পরাগ ভাবে কত আর বয়স মেয়েটার? তের-চোদ্দ। ওর চেয়েও ছোট। ওকে বিয়ের প্রস্তুতির জন্য ঘরে আটকে রেখেছে? মেয়েটার তো পড়ালেখা করার ইচ্ছে আছে। তাহলে অসুবিধা কি ছিল পড়তে দেবার? মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের এই মনোভাবটার কি পরিবর্তন হবে না? পরাগ ভাবে বড় হলে এ নিয়ে কাজ করবে ও।

পরাগকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ওর দিকে তাকায় রাধু।

এতক্ষণে ওর নজরে পড়ে পরাগের হাতের খাতাটা, 'কি লিখছ এত বইসে বইসে?'

'কবিতা।'

'বা বা কবি তুমি? কি কবিতা লিখ? আমি বুইঝব?'

'পড়ে দেখ' বলে পরাগ খাতাটা বাড়িয়ে দেয় রাধুর দিকে।

রাধু একহাত দিয়ে চামচ ধরে অন্য হাত দিয়ে খাতাটা নেয়।

কিছুক্ষণ পড়ে, তারপর বলে, 'বড় খটমট। কিছুই বুইঝে উঠতে পাইরছি না। ই সমস্ত শক্ত শক্ত কথা তুমার ভিতর থিকে বাহির হয় কি কইরে, হু?'

পরাগ বলে, 'কবিতা বোঝা কঠিন না। তোমাকে কবির মনের ভাবটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দেখবে কঠিন লাগছে না।'

রাধু হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, 'তুমারে তো আমি চিনিই না। তুমার মনের ভাব বুঝব কি করে?'

তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়ে মাচান থেকে, 'যাই। আর দেরী করলে মার কাছে আবার বকা খেতে হবে।'

পরাগ তাকিয়ে তাকিয়ে দৌড়ে রাধুর চলে যাওয়া দেখল। কতদিন পর কারো সাথে এরকম মন খুলে কথা বলল ও! রাধুর কথা বলার মাঝে কি যেন আছে। খুব সহজেই আপন করে নিতে পারে। মনটা পালকের মতো হাল্কা লাগছিল পরাগের। কিছু শব্দ ওড়াওড়ি করছিল ওর মনে প্রজাপতির রঙীন পাখার মতো। ও ধরতে পারছিল না। খুশীতে দুলতে দুলতে পরাগ বাড়ি ফিরে এল। মা উঠোনে বসে কি সব কাগজপত্র দেখছিল।

পরাগকে আসতে দেখে বলল, 'শোন আজকে গ্রামের কিছু লোককে ডেকেছি কথা বলার জন্য। তুই কোথাও যাস না। বাড়িতে থাকিস।'

'আমি থেকে কি করব? যা কথা বলার তাতো বলবে তুমি।'

'তোকে থাকতে বলেছি থাকবি। কাদের সাথে কথা বলছি তোর চেনার দরকার আছে।'

দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়লে এক এক করে বেশ কিছু লোক জড়ো হতে থাকল ওদের উঠোনে। প্রায় গোটা বিশেক লোক। জয়নাল আর শহীদ তাদের সাথে ঘুরে ঘুরে কথা বলে। দাওয়ায় বসে পরাগ দেখতে থাকে মানুষগুলোকে। মাঠে কাজ করে করে সবার বেশ পেটানো স্বাস্থ্য। এ অঞ্চলের লোক অনাহারে ভোগে না। কাজ করে। পেটভরে খাওয়াদাওয়া করে। সবার চেহারার মধ্যে একটা ঔজ্জ্বল্য আছে। মুখের হাসির মাঝে আছে নির্ভেজাল সরলতা। দেখে বেশ ভালো লাগে পরাগের। মা বের হয়ে আসে ভেতরের ঘর থেকে। পরনে কালো পাড়ের সাদা শাড়ি। মাথায় ছোট একটা ঘোমটা। কোনো গহনা নেই। কোনো প্রসাধন নেই। পরাগ অবাক হয়ে দেখে। এই সাধারণত্ব নিয়েই মাকে অসাধারণ লাগে। মা মোড়ায় এসে বসে।

বলে, 'আপনাদের সাথে আমার কোনোদিন কথা হয় নি। আপনারা আমাকে চেনেন না। আমিও সবসময় ঢাকায় থেকেছি। গ্রামে এসেছি হাতে গোনা কয়েকবার। আমাদের আগে চেনাজানা হোক। আমার নাম আলো। আমি এ বাড়ির বড় বৌ। মৃত রাশেদ মিয়ার স্ত্রী।'

কথাটা বলে আঁচলের খুঁট দিয়ে মা চোখটা মোছে। একটু থামে।

তারপর বলে, 'এবার আপনাদের পরিচয় দিন।'

এক এক করে সবাই নিজের নাম বলে। পরাগ ভাবে মা কি মনে রাখতে পারবে কোন নামের সাথে কোন মুখ?

সবার পরিচয় শেষ হলে আলো বলে, 'আপনারা জানেন এ বাড়ির ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। জমিজমার মালিকানা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছে। মানুষ খুন হয়েছে। যারা এর জন্য দায়ী তারা এখন জেলে আছে। নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার দেবর রতনও এখন জেলে। আর আমার স্বামী তো জীবনটাই দিয়ে দিয়েছেন। জমিজমার মালিকানা আবার আমাদের হাতে ফিরে এসেছে। সরকারের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে আমি জমির দলিল নিয়ে এসেছি। এটা তার কপি।'

আলো কাগজটা উপরে তুলে দেখায়।

'জমিজমা দেখাশুনার দায়িত্ব এখন আবার আমাদের নিতে হবে। আমরা দুই বৌ। আমাদের উপর এসে পড়েছে এই দায়িত্ব। সখিবোনের ছোট ছোট সন্তান। তাদের দেখাশোনা করতে ওর দিন চলে যায়। আমিও এসেছি শহর থেকে। সবকিছু ঠিকমত বুঝি না। জয়নাল আমাকে সাহায্য করছে আর আমি ধীরে ধীরে শিখছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কি দরকার জানেন আপনাদের সাহায্য। আপনারা গ্রামের মানুষেরা যদি আমাদের পাশে না থাকেন তাহলে যারা এর আগে চক্রান্ত করে আমাদের জমি দখল করার নক্সা করেছিল তারা আবার ঝামেলা পাকাবে। আমাদের লাঠিয়াল নেই। বন্দুক নেই। আপনারাই আমাদের শক্তি। আর কিছুদিন পর ধান উঠবে। তখন ধান কাটা, মাড়াই করা, গোডাউনে নিয়ে যাওয়া এ সবের জন্য আমাদের অনেক লোকের সাহায্য লাগবে। এই দুঃসময়ে আমাদের তাই আপনাদের আরো বেশী করে দরকার। আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন তো?'

মার কথাগুলো শুনে পরাগ অবাক হয়ে যায়। মা এতো গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে পারে? একটু কান্নাভেজা আবেগ তার সাথে দৃঢ় প্রত্যয় এই দুই কি সুন্দরভাবে মিশে গেছে মার কণ্ঠে!

কথা শেষ হতে সবাই একসাথে মাথা নাড়ে, বলে, 'আমরা আছি আপনার সাতে। কুনো চিন্তে কুরতে হবে নাকো আপনাকে। আপনাদের কেউ ক্ষেতি করতে এলে আমরা সবাই মিলে ঠেকাবোনে।

কুনো ভাবনা করবেন না। আর যা যা করতে হবে জয়নালের সাতে আপনার সাতে কথা বুলে আমরা সব কইরে দিব।'

আলোর বুক থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে যায়। হাত তুলে সালাম করে সবাইকে। শহীদ এসে সবাইকে ভাঁড়ে করে চা আর তিলের নাড়ু দিয়ে যায়। খাওয়া শেষ হলে আলোকে সাধুবাদ দিতে দিতে চলে যায় সবাই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। আলো দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসে। ভীষণ হাল্কা লাগছে নিজেকে আবার খুব ক্লান্তও লাগছে। ওর নিজেরও বিশ্বাস হতে চায় না এতগুলো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কি করে এই কথাগুলো ও বললো। খুব মনে হতে থাকলো রাশেদের কথা। এভাবে কথা বলতে পারতো রাশেদ। ওর স্বামী কি ওর ভেতরে স্থান নিয়েছিল সেই সময়। ভীষণ একাকী লাগতে লাগল আলোর। পরাগ উঠে এসেছিল মার কাছে। আলো কোলে পরাগের মাথাটা তুলে নিয়ে অনেকদিন পর মন খুলে কাঁদলো।

ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পরাগের। কি মনে করে হাঁটতে হাঁটতে ও চলে এসেছিল ধানক্ষেতের কাছে। বিস্তৃত বিশাল ক্ষেত ওদের। বোরো ধানের সবুজ পাতা মখমলের মতো হয়ে আছে। নাচছে বাতাসের ঈষৎ কম্পনে। হাল্কা সোনালী আভা লেগেছে শিষে। এবার নাকি বাম্পার ফলন হয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই ধানকাটা শুরু হবে। দোফসলী জমি ওদের। এই ধান কাটা হলেই আবার আবাদ হবে আমন ধানের। আল ধরে ধরে ক্ষেতের এ মাথা থেকে ও মাথা পার হয়ে গেল পরাগ। কিছুদূর পরেই গড়াই নদী। স্থির শান্ত হয়ে আছে। ঘাটে বসে নৌকার বয়ে যাওয়া দেখছিল পরাগ। একটা নৌকা কিছুক্ষণ পর ঘাটে এসে লাগল। ছৈ-এর ভেতর থেকে বের হয়ে এল রাধু, সাথে এক ভদ্রমহিলা আর ছোট একটা ছেলে।

পরাগকে দেখেই রাধু খুশীতে আটখানা হয়ে গেল, 'আরে তুমি ইখানে বসে কি কইরছ?'

'এমনি বসে আছি। তা এত সকালে কোত্থেকে এলে?'

'আমার পিসীর বাড়ি গিয়েছিলামগো। পিসীকে আর পিসাতো ভাইরে সাতে কইরে নিয়ে এসেছি। তুমি যাবে নাকি গেরামের দিকে? চল যেতে যেতে কথা বুলি।'

ছোট ছেলেটা ওদের আগে আগে দৌড়ে যেতে থাকলো। মাঝখানে রাধুর পিসী। পেছনে রাধু আর পরাগ পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

'আমারে পিসীর বাড়ি পাঠায়েছিল কেন জানো? পাত্র দেখাতে। সেজেগুজে ছেলে আর তার বাড়ির লোকের সামনে হাঁটতে বলল। ভাত বাইরে খাওয়ালাম। এক ঝলক দেখেছি। মোটা গোফ আছে।'

রাধু বেশ মজার স্বরে কথাগুলো বলছিল কিন্তু পরাগের মনে হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে বেশ কষ্টের মধ্যে আছে রাধু।

পরাগ বলল, 'তোমাকে পছন্দ হয়েছে ওদের?'

'আমারে তো কিছু বলেনি। তবে পিসে পরে বুলেছে মনে হয় হয়েছে। এখন বাবার সাতে কথা বুলতে আসবে দেনা-পাওনার আলাপ করতে।'

'বিয়ে হয়ে চলে যেতে তোমার খারাপ লাগবে না রাধু?'

রাধু কোনো জবাব দেয় না। হঠাৎ চুপ করে যায়। মনের দুঃখের কথা মনে হয় রাধু বলতে চায় না। অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছিল ওরা। রাধু চুপ করে যাওয়ার পর আর কথা আগাচ্ছিল না।

পরাগের চমক ভাঙল কার ডাকে, 'কই যাস রে রাধু, সঙ্গে কে?'

পরাগ দেখল পথের পাশে কলতলায় বসে দাঁতন করছে এক লোক। দাঁতন করে লাভ কি হচ্ছে পরাগ বোঝে না। দাঁততো হলুদ হয়ে আছে।

রাধু জবাব দেয়, 'আমার রহিম মিয়ার নাতি।'

'তাই নাকি? বাঃ বা। বেশ জোয়ান-মর্দ হইয়ে উঠেছে দেখছি। তা তুর সাতে উর দেখা হল কুথায়?'

'নদীর ঘাটে বইসেছিল। আমি পিসীকে নিয়ে আইসছি।'

'বাঃ বা। সেই নদীর ঘাট থিকে হাটতে হাটতে আইসছিস। তা তুর সাতে দেখি ভালোই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দেখতেছি।'

'কি যে বুল না মহিকাকা। ঠিক আছে, যাই এখনি।'

'যা, পরে কথা হবেনে।'

রাধু আর পরাগের দিকে তাকিয়ে লোকটা দন্তবিকশিত হাসি হাসে।

পরাগ জিজ্ঞেস করে, 'কে লোকটা?'

'তুমার চাচার বন্ধু লাগে। নাম মহি।'

নামটা শুনে পরাগের শরীরটা কেঁপে ওঠে। মা বলেছে এই লোকটার কাছ থেকে সাবধানে থাকতে। ও একটু পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে।

'আস্তে হাট না আমি তো কুলিয়ে উঠতে পাইরছি না।'

রাধুর কথা শুনে পরাগ সম্বিত ফিরে পায়। গতি শ্লথ করে রাধুর পাশাপাশি চলে আসে। রাধুকে খুব ভালো লাগে পরাগের। সহজ-সরল সদা হাস্যময়। কোনো মালিন্য নেই ওর মাঝে। ইচ্ছে হয় রাধুর হাত ধরতে। কিন্তু সাহস পায় না।

ধান কাটার মৌসুম শুরু হতে হতে পরাগের রেজাল্ট বের হবার সময় প্রায় হয়ে এল।

আলো পরাগকে বলল, 'ধান ওঠার আগে যেন তোর রেজাল্টটা বের হয় না রে। নাহলে এদিকটা সামলাবে কে?'

সারা গ্রাম মেতে উঠেছে ধান কাটার উৎসবে। পুরুষেরা ধান কাটছে মাঠে আর মেয়েরা বাড়িতে ধান মাড়াই করছে। প্রতিটি বাড়ি মুখর হয়ে আছে কর্মের আয়োজনে। সবার সাথে সাথে পরাগও হাত লাগাচ্ছে। পরাগের উপস্থিতি যেন বাড়িয়ে তুলছে সবার কর্মস্পৃহা। কয়েকদিন দেখা হয় নি রাধুর সাথে পরাগের। সারা সকাল ক্ষেতে ছিল পরাগ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমবাগানে এসে শুয়েছিল পরাগ কবিতার খাতাটা হাতে নিয়ে। দূরে রাধুকে দেখতে পেল বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনমনে। উদাস হয়ে আছে। বাইরের জগৎ যেন স্পর্শ করছে না ওকে।

'এই রাধু' ডাক দেয় পরাগ।

পরাগের ডাকে যেন ঘোর ভাঙে রাধুর।

তারপর দৌড়ে আসে পরাগের কাছে, 'তুমি ইখানে? ধানকাটায় যাওনিকো?'

'গিয়েছিলাম সকালে। তুমার খবর কি বল? ধান মাড়াই করছ?'

'মা না কইরেছে কিছু করতে। ধান উঠলে পরে তো আমার বিয়ে। তাই বুলেছে শরীরের যত্ন কইরতে।'

'তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?'

বিশ্বাসই হতে চায় না পরাগের। ওরা দু'জন চুপ করে থাকে। রাধু বসেছিল পরাগের মাথার কাছে। আস্তে আস্তে পরাগের চুলে বিলি কেটে দিতে থাকে। আরামে পরাগের চোখ বুঁজে আসে।

ওদের ঘোর ভাঙে মানুষের উত্তেজিত কোলাহলে। পরাগ চোখ খুলে দেখে রাধুর বাবা আর কয়েকজন লোক ছুটে আসছে ওদের দিকে। সেই দলের মধ্যে মহিও আছে। রাধু লাফ দিয়ে মাচান থেকে নেমে আসে। পরাগও উঠে বসে।

'এইতো এইতো পেইয়েছি রাধুরে। আইজ সারাদিন ধইরে মেয়েটা নিরুদ্দেশ। এই রাধু, ইদিক আয়, চল বাড়ি চল। দু'দিন পর বিয়ে এখুনো তোর সারাদিন টো টো কইরে ঘুরে বেড়ানো গেলনানে।' রাধুর বাবা কণ্ঠে রাগ নিয়ে বলে।

'ওকি নিজে থেকে এসেছে নাকি উই ছুকরা উরে ধইরে নিয়ে আইসেছে?' রাধুর বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে মহি বলে।

পরাগ রাধু দু'জনেই শুনতে পায় কথাটা।

রাধু চমকে ওঠে, বলে, 'না না আমি তো নিজের ইচ্ছেয় ঘুইরে বেড়াচ্ছি সারাদিন। এই আমবাগানে এসে উর সাতে দেখা হইয়ে গেল।'

'দুদিন বাদে বিয়ে আর মেয়ে তুমার বাইরের ছেলের সাতে আশনাই কইরে বেড়াচ্ছে এ কেমুন কথা গো হরিপদদা?' মহি চিমটি কাটে।

হরিপদ রাগে লাল হয়ে ওঠে, 'হারামজাদী। আর যদি বাড়ি থেকে বাহির হইয়েছেস তুই, তুর ঠ্যাং আমি ভেঙে ফেইলব।'

'আহা শুধুমুধু মেইয়েটাকে বুকছ কেন হরিপদদা। ছুটো মানুষ। উ কি কিছু বুঝে না কি? উই ছেলে নিশ্চয় উরে ভুলিয়ে ইখানে নিয়ে এসেছে। আবার দেইখেছ কেমন ঘন হয়ে রাধুর কোলের কাছে মাথা নিয়ে শুয়ে ছিল? শহরের ছেলে উদের মতলব খারাপ।'

মহির কথা শুনে হরিপদ গুম মেরে থাকে, রাধুকে বলে, 'তুই বাড়ি যা।'

রাধু নড়ে না।

'পালা নইলে মাইরব এক চড়।'

বাবার কথা শুনে আঁচলে মুখ চেপে রাধু দৌড়ে চলে যায় বাড়ির দিকে। হরিপদ আর মহি পরাগের সামনে এসে দাঁড়ায়।

হরিপদ বলে, 'শুনো বাপধন, শহর থেইকে এইসেছো বেশী বাড়াবাড়ি কইরো না। আবার যদি তুমাকে রাধুর সাতে দেইখিছি জান নিয়ে ফিরতে পাইরবানানে।'

মহি যোগ দেয়, 'বেশী লাফালাফি কইরো নানে। এইবার ধান ঘরে তুলতে পেরেছ। কিন্তু যাদের কাছে তুমার চাচা জমি বেইচেছে তারা ফিরে আইসলে কিন্তু তাদের হক ফিরত দিতে হবে। খুব সাবধান হইয়ে যাউ। যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে তা হলে ঢাকায় চইলে যাউ।'

পরাগের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না। একটু ভয় পেয়েছে ঠিকই কিন্তু মনে হয়েছে ওতো কোনো অন্যায় করে নি তাহলে ভয়ের কি আছে? পরাগ কিছু বলে না কিন্তু চোখ তুলে সটান তাকিয়ে থাকে। ওর তাকানো দেখে ওরা যেন ভয় পেয়ে যায়।

হরিপদ বলে, 'চল চল সবাই। অনেক কাইজ ঘরে পইরে আছে।'

ওরা চলে যেতে থাকে, শুধু মহি দাঁড়িয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

দাঁত চেপে বলে, 'তুর মা শান্তিপুর গেরামের রাণী হতে চায় না? শহর থিকে আসা রাণী। বলিস এই রাণীগিরি বেশীদিন চইলবে নানে। এই শান্তিপুর গেরামে বাহিরের লোকের মাতব্বরি আমরা সইহ্য কইরব নানে। যদি ঢাকায় ফিরে না যাস রমজানের মতো তুদের লাশ গড়াই নদীতে ভাসতে দেখবে গেরামের লোক।'

লুঙ্গির খোঁটাটা হাতে ধরে মহি দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যায় হরিপদর দলে মিশে যেতে। পরাগ হতভম্ব হয়ে বসে থাকে। কি হল হঠাৎ এটা? অকস্মাৎ ওরা যেন ভিলেন হয়ে গেল এই গ্রামে। যারা ওদের সাহায্য করছে তারাও কি এরকমই ভাবে? ওদের কি চলে যাওয়া উচিৎ এখান থেকে? পরাগ বাড়ির দিকে পা চালায় মাকে জানানোর উদ্দেশ্যে।

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

পর্ব-১২

এই প্রথম এত বড় একটা ঘরে ক্লাশ করল পরাগ। একে বলে গ্যালারী। স্টেডিয়ামের মতো সিঁড়ি। প্রতি সিঁড়িতে লম্বা কাঠের বেঞ্চ আর ডেস্ক। প্রায় দেড়শ জন ছাত্র ওদের সেকশানে। প্রথম দিন সব শিক্ষক এসে গল্প করলেন। জানতে চাইলেন কারা ভালো ফল করেছে মাধ্যমিক পরীক্ষায়। হাতে গোনা কয়েকজনের সাথে পরাগও উঠে দাঁড়ালো। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অপ্রত্যাশিত ভালো ফল হয়েছে পরাগের। মাতো পরাগের ফল দেখে বাবার কথা বলতে বলতে অনর্গল কেঁদেছে। ওদের স্কুল থেকে আরো চারজন এসেছে ঢাকা কলেজে। ক্লাশ শেষ হতে পরাগ কিছুক্ষণ কথা বলল ওদের সাথে তারপর হাবিবমামার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল।

পরাগের পরীক্ষার পর ওরা যখন গ্রামে যাবার সিদ্ধান্ত নিল তখন হাবিবমামাই মাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'তোরা বাড়িভাড়া শুধু শুধু টানবি কেন? বাড়িটা ছেড়ে দে। আমার তো এত বড় বাড়ি। আমার এখানেই তোরা থাক।'

মা প্রথমে রাজী হতে চায়নি কিন্তু পরে ছবিমামী এমন করে বললেন যে রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। চাকরিটাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে বলেছিল আবার যদি আলো ফিরে আসে তবে ওর জন্য চাকরি সবসময় থাকবে। ধান ঘরে ওঠা আর পরাগের রেজাল্ট বের হওয়া দু'টো প্রায় কিছুদিন আগে পিছে করে ঘটল। যারা সাহায্য করেছে তাদেরকে ধানের ভাগ গিয়ে, বাকী ধান গোডাউনের মালিকের কাছে বিক্রি করে, টাকাটা ব্যাংকে রেখে আলো আর পরাগ ঢাকায় ফিরে এসেছিল।

যাবার সময় রবি মোক্তার বলেছিলেন, 'মা আপনি থাকাতে সব সুন্দর কইরে সম্পন্ন হইয়েছে। আপনি ঢাকায় গিয়ে পরাগ বাবাজীর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত কইরে কিন্তু আবার আইসবেন। রতন বাবাজী জেল থেকে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে হাল ধইরে রাইখতে হবে।'

পরাগকে কলেজে ভর্তি করে সব গুছিয়ে দিয়ে আলো আবার গ্রামে ফিরে এল। ভাইয়ের বাড়িতে কোনো কষ্ট না হলেও আলোর কেমন জানি দমবন্ধ হয়ে আসতো। অন্যের সংসার। তাতে কি স্বাধীনভাবে থাকা যায়? পরাগ সবসময় বলে আলো শান্তিপুর গ্রামের রাণী। আলো হাসে। ভালোই সময় কেটেছে ওর গ্রামে কয়েকটা মাস। অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। অনেক সময় কেটেছে ব্যস্ততায়। দুঃখময় দিনগুলোর স্মৃতি ভুলে নতুন জগতে নতুন করে জীবন শুরু করতে পেরেছে। কত লোক পেয়েছে ওর কথা শুনে কাজ করার জন্য। ও একটা করে কথা বলেছে আর অমনি কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাজটা করার জন্য। আলো ভাবে কিছুদিন আগে ও নিজে সারা রাত জেগে মানুষের ফুটফরমাস খাটত। আর আজ ও জমির মালিক হয়ে তার কর্তৃত্ব করছে। কি অদ্ভুত এই জীবন!

সকালবেলাটা ব্যস্ততার মধ্যে কাটে আলোর। সখির সাথে সাথে ছেলে-মেয়ে দু'টোকে স্কুলের জন্য তৈরী করে দেয়। তারপর ওরা স্কুল থেকে ফেরার আগ পর্যন্ত অনেকটা সময় আলো নিজের করে পায়। কাজ না থাকলে রবি মোক্তার মাঝে মাঝে আসেন। আলোকে আইনের বিভিন্ন মারপ্যাঁচ শেখান। পায়েল আর সখিকে নিয়ে কখনো আলো ঘুরে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। আলোর জন্ম, বেড়ে ওঠা ঢাকা শহরে। গ্রামের সাথে কোনোদিন যোগাযোগ হয়নি ওর। ওর কাছে গ্রামের সব কিছুই নতুন, সব কিছুই মনোমুগ্ধকর আবিষ্কার। গ্রীষ্ম তার উপস্থিতি প্রমাণ করছে চারদিক পুড়িয়ে দিয়ে। তার মাঝেই ঘোমটায়

মাথাটা আড়াল করে আলো এসে হাজির হয় মন্ডল বাড়ি। খুব ভালো গুড় বানান মন্ডল বাড়ির গিন্নী। আলো বসে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে। বুড়ো পরাণ সূত্রধর কাঠের আসবাবপত্রের পাশাপাশি কাঠখোদাই করে ছোট ছোট পুতুল তৈরী করে। নিজের শখে। কি নিপুণ হাতের কাজ! ঢেঁকিতে পাড় দিতে থাকা গৃহবধূর মুখে শ্রমের শ্রান্তি আর কর্মসম্পাদনের তৃপ্তির মিশ্রণকে কি অনায়াসে তুলে আনে ছ' ইঞ্চি লম্বা পুতুলগুলোতে। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত অব্দি চলে যায় আলো। রোপা আমনের চারা মাটি থেকে সারাৎসার নিয়ে পুষ্ট হয়ে উঠছে। আলোর খুব ভালো লাগে দেখতে।

এ বছর দূর্গাপূজা আর ঈদ পড়েছে পর পর। পরাগের কলেজে তাই লম্বা ছুটি। পরাগ বইখাতা ব্যাগে ভরে উঠে পড়ে রাতের বাসে। গ্রামের নিরবতা খুব টানে ওকে। এই প্রথম একা একা কোথাও যাচ্ছে ও। আজ সারাদিন ক্লাশ করেছে। শরীরটা ক্লান্ত ছিল বেশ। বাসে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল পরাগ। ঘুম ভাঙল একেবারে গ্রামের কাছে এসে। বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ। পরাগ ঘাটে এসে দেখল নৌকা বাঁধা আছে। এখনো ভোর হতে অনেক বাকী। নৌকা এল কোথা থেকে?

পরাগ ডাক দেয়, 'কেউ আছেন নাকি ভেতরে?'

ছৈ-এর ভেতর থেকে মাঝি বের হয়ে আসে।

চিনতে পারে পরাগকে, 'কাল রাইতে বই দেখতে গিয়েছিলামগো। ফেরার সময় পিরথিবী ভাসিয়ে বিষ্টি এল। সেই বাদলের মইধ্যে রাইতের বেলা নদী পার হতে সাহস করলনানে। দেখছই তো মসুমের পর নদী কি রকম ফুইলে উঠেছে। তাই ঘাটে নৌকা বেঁধে ঘুমিয়ে পইরলাম। ঘুমটা কেটে গেছে। চল তুমারে নিয়ে যাই।'

বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মাঝি মাথায় একটা বড় মাথাল দিল। পরাগ নিজেকে লুকিয়ে রাখল ছৈ-এর ভেতর। এখনো ঘন অন্ধকার চারিদিকে কিন্তু নদী পারি দিতে মাঝির দেখতে হয় না। চোখ বেঁধে রাখলেও আন্দাজে পার হয়ে যেতে পারে ও।

পরাগের সাথে সাথে বাড়ি পর্যন্ত মাঝি এল পথ দেখাতে। অনেকদিন গ্রামে থাকলেও এত অন্ধকারে দু' মাইল পথ হেঁটে বাড়ি পৌঁছানো পরাগের পক্ষে সম্ভব হতো না। বাড়ির সবাই তখনো ঘুমিয়ে আছে। বৃষ্টিটাও ধরে গেছে।

পরাগ মাঝিকে বলল, 'তুমি চলে যাও। আমি বাগানে একটু ঘুরি। তারপর মাকে ডাকবো।'

পেয়ারাগাছটার নীচে এসে দাঁড়ায় পরাগ। গাছটার গায়ে হাত বুলায়। ভেজাগাছের পাতা থেকে কয়েক ফোঁটা জল পরাগের মাথায় এসে পড়ে। পরাগ মুখটা তুলে গাছটা ঝাঁকি দেয়। জলের ধারা বৃষ্টি হয়ে এসে পড়ে ওর মুখের ওপর। কি যে আরাম লাগে।

মুখটা নামিয়ে সামনের দিকে তাকাতে পরাগ দেখে একটা কুপির আলো দুলছে রাধুদের বাড়ির সামনে। জ্বলন্ত কুপি নিয়ে কেউ বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। কুপির মিটমিটে আলোয় মানুষটাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে শাড়ি পরা কেউ। রাধু নয়তো? অন্ধকারে মিশে পরাগ এগিয়ে যায়। কাছে এসে টের পায় সত্যিই রাধু।

পরাগ চাপাস্বরে ডাক দেয়, 'এই রাধু।'

রাধু প্রথমে চমকে যায় ডাক শুনে। তারপর পরাগের গলার স্বর চিনতে পেরে ওর মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে।

কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে বেড়ার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে আসে রাধু, 'তুমি কি কইরছ ইখানে? এত রাইতে?'

'এই মাত্র ঢাকা থেকে আসছি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে আছে তাই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কি করছ এখানে? তোমার না বিয়ে হয়ে গেছে?'

'পূজাতে নাইয়র আইসছি। উনিও আইসছেন আমার সাতে। ঘুমটা চইটে গিয়েছে। তাই বাইরে এসেছিলাম মুখে জল দিতে। তা কেমন আছ তুমি? ঢাকা শহর থিকে গেরামে আইসতে মন চাইল?'

'গ্রাম আমার খুব ভালো লাগে রাধু। আমার কথা থাক তোমার কথা বল। কেমন লাগছে শ্বশুরবাড়ি?'

'ভালোই। বাড়িতে অনেক লোক। আমি তার ভিড়ে হারিয়ে যেইতে পারি। উনি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। কয়েকজনের সাথে মিলে মাছের চাষ শুরু কইরেছেন। রাতের বেলা দেখা হয় উনার সাতে। আমি সারাদিন শাশুড়িমার পিছে পিছে ঘুরি।'

রাধুর কণ্ঠে কেমন যেন শীতল বিষণ্নতা ঝরে পড়ে।

পরাগের খুব কষ্ট হয়। যে রাধু সারাদিন টই টই করে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াত সে এখন গৃহবধূ হয়ে চারদেয়ালের গন্ডীতে বন্দী হয়ে পড়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে কে জানি কাশি দিয়ে ওঠে।

রাধু বলে, 'আমি এখুন যাই। তুমি কাল রাইতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে আইস। কথা বুলব নে।'

পরাগকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে রাধু হাতটা নেড়ে চলে যায়।

পরাগ স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ঢাকায় ফিরে আসার পর সব সময় রাধুর কথা মনে পড়ত ওর। কি এক প্রাপ্তি আর সব কিছু হারিয়ে ফেলার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছে পরাগ। সেই অনুভূতিগুলোর নেপথ্যে নেচে বেড়িয়েছে রাধুর হাসিমাখা মুখ। কাল রাধু আবার ডেকেছে ওকে। কি বলবে ও? ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে। তাহলে কেন পরাগকে ডাকলো ও? আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে পরাগ এসে ঘরের দরজা ধাক্কা দেয়। আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে আসছে। মা সবসময়ই খুব ভোরে উঠে। মনে হয় জেগেই ছিল। দু'টো ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে পরাগকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

দিনটা পার হয়ে গেল পুনম-ফরিদের সাথে সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে। মহি দূর থেকে দেখল পরাগকে। কিছু বলল না। বাড়ির দাওয়ায় বসে হরিপদও দেখল পরাগকে। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না পরাগের। কখন ঘুমাবে সবাই? দাদার বিশাল বিছানাটায় বসে পরাগ ছটফট করছিল। মা ঘুমিয়ে আছে পাশের ঘরে। অন্য পাশে চাচী ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ওদের কথা শোনা যাচ্ছে এখনো। অপেক্ষা করতে করতে পরাগের চোখটা ঢুলে এসেছিল। হঠাৎ ঘোরটা কেটে যেতে টের পেল রাত অনেক হয়েছে। দরজা খুলে চুপি চুপি বের হয়ে এল পরাগ। আজ আকাশে মেঘ নেই। তবে চাঁদও নেই। পরাগ জামগাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। কি করে বুঝবে রাধু পরাগ এসেছে কিনা? বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না পরাগের। রাধু এসে গেল একটু পরই। চুপি চুপি পা টিপে টিপে। ওরা দু'জন মাচানে এসে বসল।

রাধু বলল, 'জানো, আমার না ইকটুও ভালো লাগে না উই বাড়িতে। সবাই অনেক বড় বড়। কারুর সাতে আমি কথা বুলতে পারি না। ভয় হয়।'

পরাগ কোনো জবাব দিতে পারে না। কি বলবে ও? ওর কি কোনো সাধ্য আছে রাধুকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করবার? পরাগের বাম বাহুতে রাধু মাথাটা হেলান দেয়। পরাগ ডান হাত দিয়ে পরম মমতায় বিলি কেটে দিতে থাকে রাধুর চুলে। অনেকটা সময় নিঃশব্দে বসে থাকে ওরা। চারপাশ এত নিরব যে ওরা কথা বলার সাহস করছিল না। কেউ জেগে থাকলে শুনতে পাবে।

রাধু ফিস ফিস করে বলল, 'আজ যাই। উনি টের পেয়ে যাবেন। কালকে আবার আসবো নে।'

রাধু চলে গেল কিন্তু পরাগ নড়তে পারলো না। কিছু কথা প্লাবনের মতো ভেসে এল ওর বোধের রাজ্যে

ইচ্ছে করছে ছড়িয়ে যেতে
ছাড়িয়ে যেতে নিজের সীমা - আসবে সাথে?

কোথায় তুমি? ঘুমিয়ে আছো?
জড়িয়ে আছো স্বপ্ন-বালিশ - আমায় নিয়ে?
ভালবাসব, সরবে দূরে
ছড়িয়ে যাবে ছাড়িয়ে যাবে - এই কি খেলা?
ইচ্ছে করছে ছাড়িয়ে যেতে
সীমানা নিজের, ছড়িয়ে যেতে - তোমার ঘুমে?
ছায়ার মাঝে ভালবাসবে
আলো এলেই লুকিয়ে যাবে - নিয়ম এখন?
জেগে থাকব ধরে থাকব
ছড়িয়ে যাব ছাড়িয়ে যাব - কোথায় যাবে?

এই কি প্রেম? ওর জীবনের প্রথম প্রেম কি রাধু? এই যদি প্রেম হয় তবে কেন রাধুর সাথে হল? যে সম্পর্কের পূর্ণতা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই তা কেন পরাগকে সংস্পৃষ্ট করলো কষ্টময় পরিণতির উদ্দেশ্যে? বিষাদে পরাগের মনটা করুণ হয়ে রইল ।

মার কাছ থেকে পরদিন পরাগ পালিয়ে পালিয়ে রইল । ও জানে ওর মুখের দিকে ঠিক মত চাইলেই মা বুঝে যাবে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে । সে রাতে পরাগ বাগানে গিয়ে দেখল ওর আগে থেকেই রাধু মাচানে বসে আছে ।

পরাগের মুখের কাছে কানটা এনে ফিসফিস করে বলল, 'চল পুকুর পারে গিয়ে বসি । উখানে বসে মনখুলে কথা বুলা যাবে নে ।'

বাগানের পেছন দিকে বিশাল পুকুর । বারোয়ারী । গ্রামের লোক স্নান করে, কাপড় ধোয় । বাঁধানো ঘাট আছে পুকুরটায় । ওরা এসে বসল ঘাটের শেষ সিঁড়িতে । ওদের পায়ের কম্পনে ঘাটের কাছে ঘোরাফেরা করা মাছগুলো বুদ্বুদ তুলে সরে গেল দূরে ।

রাধু বলে, 'তুমি যখুন ঢাকায় ছিলে তখুন আমার কথা মনে ছিল?'

'খুব মনে ছিল রাধু । আমার শুধু মনে হত কেমন কাটছে তোমার দিন নতুন সংসারে? তোমাকে কি যত্ন করছে ওরা? আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি এবার এসে তোমার সাথে দেখা হবে । কি যে ভালো লাগছে আমার ।'

'আমার কিন্তু মনটা কেন জানি বুলছিল তুমার সাতে দেখা হবে । মনে হচ্ছিল ছুটিতে নিশ্চয় তুমি মারে দেখতে আইসবে । পেরথমদিন রাইতের বেলা তুমাকে দেখে তাই বেশী অবাক হইনিনে । কিযে ভালো লাগছে আমার ।'

ওরা পাশাপাশি বসেছিল । রাধু নত হয়ে পরাগের হাঁটুতে মাথা রাখল । পরাগ হাতটা তুলে রাধুর চুলে রাখতে গেল আর সাথে সাথে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠল একটা টর্চ ।

'রাইতের বেলা পুকুর পারে বইসে ফষ্টিনষ্টি কইরছ? দাঁড়াউ তুমাদের মজা বুজাচ্ছি ।'

টর্চের পেছনের মুখটাকে পরাগ দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু গলা শুনে টের পেল মহি । ওর সাথে আরো কয়েকজন আছে ।

একজনকে ডেকে মহি বলল, 'যা হরিপদদাকে ডেইকে নিয়ে আয় । চুপি চুপি ডাকবি । বাড়ির অন্য কেউ যেন টের না পায় ।'

ততক্ষণে রাধু উঠে বসেছে, 'আমাদের ছাইড়ে দাও মহিকাকা । সত্যি বুলছি আমরা ইখানে বসে শুধু গল্প কইরছিলাম । আর কুনোদিন কইরবনানে । আমাদের যেতে দাউ ।'

মহি হাসে, 'ভয় করিস না। তুর কুনো ক্ষতি হবে নানে। যে তুকে ফুসলিয়ে নিয়ে আইসছে তার বেবস্থা আমরা কইরব। তা তুকেও বুলি বিয়ে হয়ে সংসার কইরছিস। যেই শহর থিকে এই ইন্দুরটা এল আর অমনি বেহাল হইয়ে গেলি?'

রাধু কেঁদে ফেলে, 'মহিকাকাগো, উ আমারে ফুসলায় নাইকো। উর কুনো দোষ নাই। আমি উকে ইখানে ডেকে নিয়ে এসেছি।'

'শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায় রে? উ যে কি জিনিস আমরা সবাই জানি। রতন মিয়ার রক্ত আছে না উর শরীরে? মালা মালা কইরে রতন মিয়াতো পথে বইসেছে। উর মধ্যেও নিশ্চয় মেইয়েছেলের পিছনে ছুকছুক করার রোগ আছে।'

ততক্ষণে হরিপদ চলে এসেছে। ঘুমচোখ ঘষতে ঘষতে।

হরিপদকে দেখে মহি বলে, 'বাজারে বইসে তাস খেইলছিলাম। ফিরতে ফিরতে রাইত হইয়ে গেল। দেখি পুকুরের কাছে কে যেন নড়াচড়া কইরছে। টর্চ মাইরে দেখি রাধা আর কেষ্ট।'

হরিপদ বলে, 'মহিভাই ভাগ্য তুমি দেইখেছ আর আমারে ডেকেছ। বাড়িতে জামাই আছে। সে জাইনতে পাইরলে তো কেলেঙ্কারী হইয়ে যাবে।'

'ইর জন্যইতো তুমারে ডেকে পাঠাইছি। রাধুরে বাড়ি নিয়ে যাউ। আমরা ইদিকটা দেইখছি।'

হরিপদ এসে রাধুর হাতটা ধরে টান দেয়। রাধু যেতে চায় না। হরিপদ কোনো কথা না বলে সজোরে চড় মারে রাধুর গালে। পুকুরের জলের উপর দিয়ে নৈঃশব্দ্য কেটে বাতাসে সমগ্র চরাচর ছড়িয়ে যায় সেই শব্দ।

পরাগ বলে উঠে, 'কি করছেন, কি করছেন আপনি?'

একপা এগিয়ে এসে রাধুকে আড়াল করতে চায়।

হরিপদ বলে, 'ওই হারামজাদা, একপা আগাবি তো তুরে একদম পুকুরে চুবিয়ে মাইরব।'

রাধুর হাতটা ধরে টান দিয়ে বলে, 'চুপ কইরে আমার সাতে চল। যদি কুনো শব্দ করিস একদম গলা টিপে মেরে ফেইলব তুরে।'

রাধুর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় হরিপদ। পরাগ অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে মহি, 'আইজ তুকে একটা শিক্ষে দেব যাতে সারা জীবন মনে থাকে।'

পরাগ কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন এসে ওর হাতটা পেছন দিকে আটকে ফেলে। আরেকজন ওর মুখের ভেতর গামছা ঢুকিয়ে বেঁধে ফেলে। মহি প্রাণ খুলে হাতের সুখ মেটায় পরাগের ওপর। খেলাধূলা করা স্বাস্থ্য পরাগের। সমস্ত শক্তি দিয়ে ও চেষ্টা করে মুক্ত হতে কিন্তু যে লোকটা ওর হাতটা ধরে রেখেছে তার গায়ে যেন অসুরের মতো শক্তি। মহির চড়-চাপড়-লাথি বৃষ্টির মতো নেমে আসতে থাকে পরাগের ওপর।

'শালা বান্দীর ছেলে, তুরে না বুলছি গেরামমুখো হবি না আর। আবার এইসেছিস? আবার গেরামের মেয়েদের দিকে নজর দিয়েছিস? তুর হাড়গোড় ভাইঙে তুর পেটে ঢুকিয়ে দিব আইজ।'

প্রথম প্রথম কিছুক্ষণ ব্যথার অনুভব ছিল পরাগের। পেটের ভেতর থেকে চিৎকার বের হয়ে আসছিল কিন্তু মুখে গামছা ঢুকানো থাকায় কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না। তারপর কিছুক্ষণ পরে সব অনুভূতি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল আস্তে আস্তে। শরীর থেকে সব শক্তি হারিয়ে গিয়ে পরাগ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ভোরবেলা পুকুরে মুখ ধুতে এসে গ্রামের লোক পরাগকে খুঁজে পেল শেষ সিঁড়িটার ওপর। রক্ত শুকিয়ে জমে আছে ওর মুখে, মাথার চুলে। মাছি ভন ভন করছে চারদিকে। জয়নাল আর শহীদকে ডাক দিয়ে নিয়ে এল কেউ। তাদের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে এল আলো। ততক্ষণে গ্রামের লোক পরাগের মুখে জল ছিটিয়ে ওকে জাগিয়ে তুলেছে। পুকুরের পারে বসিয়ে জল ঢেলে জমে থাকা রক্ত ধুয়ে দিয়েছে।

দু'জনের ঘাড়ে হাত দিয়ে পরাগ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দুর্বল লাগছে শরীর কিন্তু পায়ে জোর আছে। জয়নাল এসে পরাগকে উপরে নিয়ে এল। ভালো করে পরাগের সারা শরীর হাত বুলিয়ে দেখল কিছু ভেঙেছে কিনা। রক্ত পরিষ্কার করায় পরাগকে খুব একটা বিভৎস লাগছিল না।

আলো এসে দেখল পরাগের চুল উস্কোখুস্কো, গায়ের কাপড় ভিজে, চোখ দু'টো লাল।

'কি হয়েছে, কি হয়েছে রে তোর পরাগ?' আলোর কণ্ঠ থেকে মায়ের উদ্বেগ উছলে পড়ে।

'ঘুম আসছিল না। তাই হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পারে এসে বসেছিলাম। কতগুলো মাতাল হঠাৎ এসে আমার কাছে টাকা চাইল। আমার কাছে কিছু নেই বলতে আমাকে একটু মারধর করল। ওরা চলে যেতে আমি এখানে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'কি যে করিস না তুই? আজ থেকে তোর বাইরে যাওয়া বন্ধ। চল বাড়ি চল।'

বাড়ি এসে ভাল করে স্নান করল পরাগ। নাকটা ব্যথা ব্যথা করছে। ভাঙে নিতো। একটু সাবধানে থাকতে হবে। ভরপেট খেয়ে মার কাছ থেকে দু'টো প্যারাসিটামল খেয়ে বিছানায় শুয়ে রইল পরাগ। কি হয়ে গেল এর মধ্যে? রাধু ঠিক আছে তো? ওর স্বামী কিছু টের পায়নি তো? কি ভীষণ জোরে ওকে চড় মেরেছিল ওর বাবা! আরো কি মারধোর করেছে রাধুকে? নিজের শরীরে হাত বুলিয়ে পরাগ ভাবে বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছে ও। মহির শরীরে তেমন জোর নেই। মারগুলো জোরে লাগে নি। যে লোকটা ওর হাত দু'টো ধরে ছিল সে মারলে হয়তো বা পরাগ মরেই যেত।

দুপুর নাগাদ জয়নাল এল পরাগের কাছে, 'যে গল্প বুইলছ সেটা মা বিশ্বেস কইরছে। তা বুলে কি বুলতে চাও আমিও বিশ্বেস কইরব? এ গেরামে এখুন কোনো মাতাল নেইকো। যারা থাকতে পারতো সব এখুন জেলে। সত্যি কইরে বুল তো কি হইয়েছিল।'

পরাগ চিন্তা করে বলবে কি সত্যি কথা? তাহলে তো রাধুর কথাটা বলতে হবে ওকে। রাতের বেলা রাধু ওর সাথে পুকুরপারে বসেছিল সে কথা জানাজানি হলে তো ওর সংসারটাই ভেঙে যাবে।

পরাগ জানালার দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলে, 'যা বলেছি তাই ঘটেছে। হয়তো বা ওরা অন্য গ্রামের লোক। এদিক দিয়ে যাচ্ছিল।'

জয়নাল বিশ্বাস করতে চায় না, 'সত্যি বুললে না আমারে। যাহোক সাবধানে থেইকো। বুইঝতে পারছি তুমাদের শত্তুরেরা মাথা চাড়া দিয়ে উইঠছে। আমাদের এখুন আরো জোট বাইন্ধে থাইকতে হবেনে।'

আজ দশমী। পরাগ শুনতে পায় মিত্তির বাড়ির মন্দিরে ঢাকের শব্দ। প্রতিমা নিয়ে বের হয়ে পড়েছে ভাসানের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ পর বিছানায় শুয়ে থেকেই জানালা দিয়ে পরাগ দেখে প্রতিমা নিয়ে ভাসানের পথে বের হয়েছে বিশাল মিছিল। হরিপদকে দেখতে পায় সেই মিছিলে। ওর পাশে মোটা গোঁফের এক ভারিক্কী লোক। ওই কি রাধুর স্বামী? বয়সে তো রাধুর দ্বিগুণ হবে বা তার চেয়েও বেশী! পরাগের মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। ওর এত কাছে রাধু থাকবে আর পরাগ একবারও তাকে দেখতে পাবে না? ঈদ আসতে এখনো ছ' দিন বাকী। আরো কতগুলো দিন থাকতে হবে ওকে এখানে? কি করবে ও একা একা?

বিছানা থেকে উঠে পরাগ দাওয়ায় নেমে আসে। শরীরের ব্যথাটা আস্তে আস্তে যেন বাড়ছে। সকালে যা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক বেশী লাগছে। সারা শরীর জুড়ে। মার কোলে মাথা দিয়ে বসলো পরাগ। পুনম বাড়ি ছিল না। কিছুক্ষণ পর দৌড়ে দৌড়ে এল।

চাচী জিজ্ঞেস করল, 'কই ছিলি রে তুই এতসময়?'

'রাধুদিদের বাড়ি। আজ ভাসান হইল না? আমারে ডাইকে নারিকেলের তক্তি খেতে দিল।'

'রাধু কি ইখুনো আছে না চইলে গেছে রে?'

'মনে হয় এতক্ষণে চইলে গেছে। পূজা শেষ। আর থাইকে কি করবে?'

পরাগ আর কিছু চিন্তা করতে পারে না। বুকের ভেতরটা ভীষণ শূন্য লাগে। চোখের জলে মার শাড়ি ভিজে ওঠে।

'কিরে শরীরটা খারাপ লাগছে?' মা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ মা।' কান্না চেপে পরাগ বলে।

আলো পরাগের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, 'ঠিক হয়ে যাবে রে। এ ক'দিন বিশ্রাম কর। শরীরটা আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

পরাগ ভাবে শরীর তো ঠিক হবেই। কিন্তু ওর মন? ওর মনটা কি ঠিক হবে এত সহজে?

দেবানন্দ সরকার
আলো, অন্ধকার, আলো

শেষ পর্ব

পাঁচ বছরের সাজা হয়েছিল রতনের। জেলে থেকে ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছিল ও। কখনো কোনো ঝামেলা করেনি। সমস্ত আদেশ মাথা নত করে শুনেছে। কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করেছে। আদর্শ কয়েদী হিসেবে পরিচিতি ছড়িয়ে গিয়েছিল রতনের। নতুন সেশন জজ এসেছেন। রবি মোক্তারের পূর্ব-পরিচিত। তার কাছে দেন-দরবার করে রবি মোক্তার রতনের সাজা অনেকটাই কমিয়ে আনতে পেরেছেন। বের হওয়ার প্রায় সময় হয়ে এসেছিল রতনের। জেলে বসে রবি মোক্তারের কাছে শুনেছে ভাবী শক্ত হাতে হাল ধরে আছে। রতন ভাবে ছাড়া পেলে ও কি বাড়ি গিয়ে থাকতে পারবে? ভাবী কি থাকতে রাজী হবে ওর সাথে এক ছাদের নীচে? ভাবী যদি রতনকে বাড়িতে ঢুকতে না দেয় তাহলে রতনের বলার কি কিছু থাকবে? যে অপরাধ করেছে ও তারপর ভাবী এসে যে ওর পরিবারের দেখাশোনা করেছে তাই তো অনেক। ও ফিরে এলে ভাবী যদি বলে ঢাকায় ফিরে যাবে তখন কি করবে রতন? কি করে প্রায়শ্চিত্ত করবে কৃতকর্মের?

হেমন্ত এসে গিয়েছিল প্রায়। ভোরের দিকে একটু একটু কুয়াশা পড়ে। রাতের বেলা হিম হয়ে আসে। গায়ে কাঁথা তুলতে হয়। জয়নালকে নিয়ে আলো গিয়েছিল ধানক্ষেতে। পাকাধানের সোনালী শিষ নিজের ভারে নুয়ে পড়েছে। ধানকাটার সময় এসে গিয়েছে আবার। আবার জেগে উঠবে সারা গ্রাম। উঠোনে, মাঠে ভেজা ধান ছড়িয়ে শুকানো হবে। কি যে ভালো লাগে খালি পায়ে ধানের উপর দিয়ে হাঁটতে। বেশ খুশী খুশী মন নিয়ে আলো ফিরে আসছিল। পথের পাশে দেখল মহি আর কয়েকজন মিলে জটলা করছে। হরিপদকে দেখে চিনল আলো। বাকী মুখ গুলোও আধোচেনা। নাম জানে না আলো। শুধু একজনকে আলো দেখে নি কোনোদিন। তাকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সাদা লুঙ্গি আর নীল সার্ট পরনে। আলোকে দেখতে পেল মহি। মুখের হাসি মুছে গেল সাথে সাথে। মাঝখানের লোকটা আলোর দিকে পেছন দিয়েছিল। মহি কি বলতে ঘুরে দেখল আলোকে। দূর থেকে মুচকি হেসে আদাব দিল। আলো ফিরিয়ে দিল সেই আদাব কিন্তু বুঝতে পারলো সেই আদাবের মধ্যে দিয়ে ওকে সম্মান জানানো হয় নি, যেন কোনো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে লোকটা।

জয়নাল বলল, 'উর নাম মঈনুদ্দীন। শত্তুর পক্ষের বড় পান্ডা। শুইনেছি গতকাল নাকি ছাড়া পাইয়েছে। বাহির হইয়েই মহি আর হরিপদর সাতে জোট পাকাচ্ছে বেপারটা আমার খুব ইকটা ভালো ঠেইকছে নানে। ছোট মিয়া কবে ছাড়া পাইবে জানেন কি মা জননী? উনারে ইখুন বেশী দরকার।'

রবি মোক্তার বলেছিলেন কিছু দিনের মধ্যেই নাকি রতন ছাড়া পাবে। ঠিক কবে তা জানান নি। রতন বের হবে শুনে আলোর মনে হয়েছিল সব কিছু রতনকে বুঝিয়ে দিয়ে ও হাল্কা হতে পারবে। একটু স্বস্তির ছোঁয়া লেগেছিল ওর মনে। তার পরপরই মনে হয়েছিল তাহলে এই রাজত্ব ফেলে ওকে আবার ঢাকায় ফিরে যেতে হবে? আবার আয়াগিরি করতে হবে? মনটা ভারী হয়ে উঠেছিল। মঈনুদ্দীনকে দেখে এখন আলোর মনে হল রতন ফিরে এলে ভালোই হবে। মঈনুদ্দীনের চেহারার মধ্যে একটা ধূর্ত পাশবিকতা আছে। এ ধরণের লোকের সাথে যুদ্ধ করে টিঁকে থাকার ক্ষমতা আলোর নেই। মির্জার কথা মনে পড়ে গেল আলোর। আর সমস্ত বোধ অবশ হয়ে এল ভয়ে।

একবুক উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরে চমকে গেল আলো। দাওয়ায় বসে আছে রতন। ওকে ঘিরে আছে ছেলেমেয়েরা। সখি পাশে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। প্রশান্তিতে ভরে আছে ওর মুখ। রতন উঠে এসে

আলোর পা ধরে সালাম করল। আলোর মুখ দিয়ে কথা সরল না। ওর ভেতরে গত সাতটা বছরের স্মৃতি সহসা জাগ্রত হয়ে ওকে তছনছ করে দিল। এই সেই লোক যার কৃতকর্মের জন্য ও হারিয়েছে রাশেদকে, বিলিয়ে দিয়েছে সম্ভ্রম, দিনের পর দিন পরাগ-পারুল দারিদ্র-ক্ষুধার সাথে সংগ্রাম করে করে বড় হয়েছে। কি বলবে তাকে আলো? বাড়ি থেকে বের করে দেবে? কিন্তু এ বাড়ির মালিকতো সেও? আর এখন এই সংকটের মুহূর্তে এই লোকটাকে তো সবচেয়ে দরকার আলোর। আলোর মুখ থেকে কথা সরে না। ও পাথরের মতো নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। আলোর ঘোর ভাঙে পায়েলের আওয়াজে। ক'দিনেই খুব নেওটা হয়ে গেছে মেয়েটা আলোর।

'জেঠি, দেইখছ বাবা আইসছে।'

আলো জবাব দেয় না। ধীর পায়ে হেঁটে এসে মোড়ায় বসে।

রতন আলোর পায়ের কাছে বসে হাত জোর করে বলে, 'জানি ভাবী আমারে বুলবার কিছু নেই আপনার। আমিও যে আপনার সামনে কত যন্ত্রণা নিয়ে মুখ দেখাচ্ছি তা বুলতে পারবো না। আমি আগের রতন নেই আর ভাবী। জেলখানায় থেইকে আমি অনেক চিন্তা কইরেছি। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি ভালো হইয়ে জীবন কাটাতে চাই ভাবী। আমারে মাফ করেন। আর একবার সুযোগ দেন।'

আলো বলে, 'তুমি কি বোঝ তোমার জন্য কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার সংসারে? আজকে যদি আমার কারণে তোমার পরিবারে এত দুর্যোগ নেমে আসতো পারতে তুমি সব ভুলে আমাকে মাফ করতে? মাফ করা এত সহজ না রতন। অন্ততঃ আমার পক্ষে না। তোমাকে দেখলেই আমার রাশেদের কথা মনে পড়ে। আমি ভুলতে পারি না কত কষ্ট সহ্য করে আমার স্বামী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। একটা মুখের কথায় আমি কি ভুলতে পারবো আমার স্বামীর সেই কষ্ট? তোমাকে আমি মন থেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবো না। কোনোদিন না।'

আঁচলে মুখ গুঁজে আলো ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আলোকে কাঁদতে দেখে পায়েল জড়িয়ে ধরে বলে, 'জেঠি, তুমি কাঁদো কেন?'

আলো কান্না সংবরণ করে পায়েলকে জড়িয়ে ধরে।

বলে, 'তুমি ছিলে না আমি চেষ্টা করেছি ওদেরকে আগলে রাখার। এখন তুমি ফিরে এসেছ ওদের দায়িত্ব তুমি নাও। আমি ঢাকায় ফিরে যাব। আমার যা কর্তব্য আমি তা করেছি।'

রতন কিছু বলার আগে সখি বলল, 'আপা এই বাড়ির মালিক তো আপনি। আপনি এই বাড়ি ছেইড়ে কেন চলে যাবেন? আমারে ছোট বোনের আদর দিয়েছেন। ছেলেমেয়েগুলিরে নিজের সন্তানের মতো যত্ন কইরেছেন। উদের ছেইড়ে আপনি চলে যেতে পাইরবেন? পরাগ কি ভালোই না বাসে গেরামে আসতে। আমাদের কথা আপনার মনে পইড়বে না?'

সখির সাথে সাথে পুনম-ফরিদ-পায়েল আলোকে ঘিরে ধরে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে, 'তুমি যাইও না জেঠি, তুমি যাইও না।'

যে গম্ভীর কঠিন দুঃখময় অনুভব এতক্ষণ বাতাসে স্থির হয়ে ছিল ওদের সমস্বর চিৎকারে তা এক ফুৎকারে মিলিয়ে গেল।

আলো বলল, 'থাম থাম তোদের চিৎকারে তো মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়।'

'না আমরা থামবো না। আগে বুল তুমি যাবে না। আমাদের সাতে থাইকবে।'

'আচ্ছা বাবা থাকবো। এখন তোরা একটু থামতো।'

ওরা চুপ করলে আলো রতনকে বলল, 'তুমি বড় ভাগ্যবান রতন। এ রকম সুন্দর একটা পরিবার আছে তোমার। ওদের যত্ন করো। বলেছিলে তুমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও। যদি ঠিক করে স্বামীর দায়িত্ব

পালন করতে পারো, বাবা হয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতে পারো তবে সেটাই হবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত ।'

'আমি করব, ভাবী । আপনি দেইখবেন আমি করব ।'

'আর শোনো ধান কাটার সময় কিন্তু হয়ে এসেছে । আমি আজকে দেখে এসেছি মহি-হরিপদ-মঈনুদ্দীন মিলে জটলা পাকাচ্ছে । ওরা কিন্তু বাগড়া দিতে পারে । তুমি প্রস্তুত থেকো ।'

'হ্যাঁ আমাদের প্রস্তুত থাইকতে হবে । উদের সংখ্যা বেশী না কিন্তু খুব মারাত্মক উরা । আপনার কারণে অন্ততঃ গেরামের লোকেরা আমার সাতে আছে । দেখা যাক কি করে উরা ।' রতন চিন্তিত মুখে বলে ।

রতন ফিরে এসেছে সে খবর দাবানলের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে গেল সারা গ্রামে । সবাই জানে মঈনুদ্দীনও ছাড়া পেয়েছে । ধান কাটার সময় হয়ে এসেছে । আবার কি গন্ডগোল লাগবে গ্রামে? আবার কি রক্তে ভিজে উঠবে শান্তিপুর গ্রামের মাটি? গ্রামবাসীরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ।

জয়নাল এসে আলোকে বলে, 'গেরামের অবস্থা আমার ভালো ঠেইকছে নানে । গতবার যারা ধানকাটায় সাহাইয্য কইরেছিল তারা এবার কেমুন যেন পিছু হইটতে চাইচ্ছে । আপনার মনে হয় তাদের সাতে ঘুইরে ঘুইরে ইকটু কথা বুলা দরকার ।'

আলো রবি মোক্তারকে ডেকে পাঠাল ।

রবি মোক্তার শুনে বললেন, 'চলেন, আমিও আপনার সাতে যাই । আইনের লোক সাতে থাইকলে উরা আরো ইকটু বল পাবে মনে । রতনরে সাতে নেবার দরকার নেই । আমরা জানি উ ভালো হইয়ে উঠছে কিন্তু গেরামের লোক তো আর জানে না । উরা এখুনো রতনকে বিশ্বেস কইরতে পাইরবেনানে ।'

আলো বের হয়ে পড়ল মানুষের মনে আস্থা আনতে । রবি মোক্তার আর জয়নালকে নিয়ে ।

বলল, 'গ্রামে কিছু লোক ফিরে এসেছে । আমি বুঝি আপনারা আবার গোলমালের ভয় পাচ্ছেন । কিন্তু যারা গোলমাল করতে পারে তারা তো অল্প কয়েকজন । আমরা সবাই যদি একসাথে থাকি তাহলে আমাদের সবার জোরের কাছে কি কেউ দাঁড়াতে পারবে? আর আমরা যদি সবাই একজোট না হই তাহলে যারা এ গ্রামের পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে তারা তো আরো সুযোগ পাবে । আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে তারা লুটেপুটে খাবে । তাদেরকে বাধা দেয়া তো আমাদেরই দায়িত্ব । এ গ্রামের যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাদের মুখ চেয়ে তো আমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার । তারা যেন একটা সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে বড় হতে পারে সেই চেষ্টাই কি আমাদের করা উচিত না?'

আলোর কথা শুনে যেন ভরসা পেল গ্রামবাসী ।

আলোকে বলল, 'চিন্তা কইরবেন না মা । আমরা আপনার সাতে ছিলাম । আপনার সাতেই থাইকব ।'

আলো স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে আসে ।

রবি মোক্তার বলেন, 'গেরামের লোকরে আপনি চিনেন না, তাদের মন বদলাতে বেশী সময় লাগে না । আইজকে তারা আপনার সাতে হা হা কইরছে কালকে দেখবেন মঈনুদ্দীন কিছু বুললে তার সাতেও হা হা কইরবে ।'

তারপর রতনকে বললেন, 'তুমার কাইজ হবে মহি আর মঈনুদ্দীনরে চোখে চোখে রাখা । তারা যেন গেরামের লোকরে ভুলাইতে না পারে । তা ছাড়া আমার মনে হয় থানার ওসিরে বেপারটা সম্পর্কে জানাইয়ে রাখাটা ভালো হবে । মা জননী আপনি থানায় গিয়ে একটা কমপ্লেন কইরে আইসেন ।'

রবি মোক্তারের কথামতো সারাদিন রতন ঘুরে বেড়ায় গ্রামের বিভিন্ন কোণে । মানুষের সাথে কথা বলে । বোঝাতে চায় ও ভালো হয়ে গেছে । সেইসাথে মহি আর মঈনুদ্দীন কোথায় কোথায় ঘোরাফেরা

করে সেদিকে নজর রাখে। মহি রতনকে এড়িয়ে এড়িয়ে ছিল কিছুদিন। একদিন আমবাগানের সামনে হঠাৎ রতনের সামনে পড়ে গেল মহি।

রতন হেসে বলল, 'কিরে মহি তুই আমার এত বড় বন্ধু আর আমি জেল থেকে বাহির হইয়ে এলাম তুই একবার আমার সাতে দেখা কইরতে এলি না?

'কি যে বলিস না বন্ধু? আমি তো কয়েকদিন গেরামে ছিলেম না। বউটা বুলছিল অনেকদিন বাপের বাড়ি যায় না উকে রেখে আইসতে গিয়েছিলাম। কেমন আছিস তুই রে? তোর চেহারা কিন্তু খুব সুন্দর হইয়ে উঠছে। জেলে থাইকলে যে কেউ খুলতাই হয় এই পেরথম দেইখলাম।'

'জেল ফেরত আর কাউকে তুই কুনোদিন আগে দেখেছিস?'

'কেন মঈনুদ্দীন বাহির হইয়েছে না?'

'ও মঈনুদ্দীনের সাথে ইদানিং তোর খুব দহরম-মহরম না? আগে তো উর সাতে তুর কুনো ওঠাবসা ছিল বইলে জাইনতাম না। বরং আমার তাস খেলার পাটনার ছিল উ। তা চল না উর সাতে দেখা কইরে আসি?'

রতনের এই আকস্মিক প্রস্তাবে মহি হকচকিয়ে গেল। রতন নিজে থেকে মঈনুদ্দীনের সাথে দেখা করতে চাচ্ছে? এতো দেখি যে ভোদাই ছিল তাই আছে। কোনো পরিবর্তন হয় নি। এর কাছ থেকে তো মনে হয় আবারো জমিটা দখল করে নেয়া যাবে।

মহি একগাল হেসে বলে, 'যাবি তুই? চল। মঈনুদ্দীন তুরে দেখে কিন্তু খুব খুশী হবে।'

মহিকে সাথে করে রতন আমিন মাতব্বরের বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। মনে পড়ে একদিন এভাবেই আচমকা গিয়ে আতর আলীর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। সেই বন্ধুত্ব ওকে নিয়ে গিয়েছিল ধ্বংসের শেষ সীমানায়। সেখান থেকে ফিরে আসতে পেরেছে ও। সেই ফিরে আসাটাকে যত্ন করে লালন করতে হবে। তাকে কিছুতেই আর নষ্ট হতে দেবে না রতন।

বাড়ির বাইরে বসে গায়ে তেল মেখে রোদ পোহাচ্ছিল মঈনুদ্দীন। পুকুরে ডুব দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। রতন আর মহিকে একসাথে আসতে দেখে মুখ হা হয়ে গেল মঈনুদ্দীনের, 'আরে রতন মিয়া তুমি?'

'অবাক হচ্ছ না? আরে যা হবার তাতো হইয়ে গেছে। আমরা তাসের আসরের বন্ধু। সে কথাটাকি ভুইলে যেতে পারি? কত ফুর্তির সময় আমাদের একসাতে কেটেছে মনে পড়ে?

'তা আর মনে পড়ে না। জেল থাইকতে থাইকতে শুধু দিন গুনেছি কবে বাহির হব। কবে আবার শহরে যাব। তুমার মনে হয় নাই?'

'মনে হয় নাই আবার! দেখি ধানওঠার মসুমটা শেষ হোক, হাতে কিছু টাকা আসুক। তারপরে আবার যাওয়া যাবে নে।'

'বুইঝেছি তুমার হাত খালি। চাইলে আমি কিন্তু তুমারে ট্যাকা ধার দিতে পারি। তবে ইবার আগের মতো হবে না নে। চাচা নেই আতর ভাই নেই। ও সমস্ত কুকাজ আর হবে নানে।'

রতন হাসে, 'ঠিক আছে মনে থাইকবে আমার। যদি দরকার হয় তুমার কাছ থেইকে নিব নে। যাউ তুমি ডুব দাওগে। আমরা আইজ চলি।'

বাড়ি এসে রতন আলোকে জানাল ও মহিকে নিয়ে মঈনুদ্দীনের বাড়ি গিয়েছিল।

আলো চমকে ওঠে, 'বল কি? তোমার সাহস তো কম না? কোনো ক্ষতি যদি করত?'

'না ভাবী, মঈনুদ্দীন সবে জেল থেকে বাহির হইয়েছে। ও এখুন আমার কুনো ক্ষতি কইরবে না। কিন্তু আমি জানি বাগে পেলে ওরা আমারে ছাইড়ে দিবে না। আমার জবানীতে ওদের সবার জেল হয়েছে। আতর আলীর উকিল আমারে অনেকবার বইলেছিল মিথ্যে জবানী দিয়ে বড়ভাইরে ফাঁসায়ে উদের ছাড়ার বেবস্থা কইরতে। বুলেছিল অনেক ট্যাকা দিবে আমারে। আমি মুখে হা হা বুলেছিলাম কিন্তু

আদালতে দাঁড়ায়ে সব সত্য কথা বুলেছিলাম। সেই রাগ উদের আছে। আমি জানি উরা আমারে কিছু না কিছু ইকটা কইরবে। কিন্তু কি জানেন ভাবী শত্তুররে দূরে রাইখতে নেই। তারে রাইখতে হয় কাছে। তা হইলে জানা যায় তারা কি কইরতে চাইছে। যতদিন ধান না ওঠে আমি উদের সাতে লাইগে থাইকব। এর জন্য আমারে ইকটু শহরেও যেতে হইতে পারে। আপনারা আমারে ভুল বুঝেন না। আমি কুনো খারাপ কাইজ করার জন্যি শহরে যাবো না। শুধু যাব উদের উপর নজর রাখার জন্যি।'

মঈনুদ্দীনের সাথে আবার শহরের সেই গলিতে উপস্থিত হল রতন। বাড়ির কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি গত ছ' বছরে। শুধু মানুষগুলো বদলে গেছে। কাঞ্চিকে মাসি বিক্রি করে দিয়েছে ঢাকা শহরের কার কাছে। বেশ চড়া দামে। মাসির ঘরের বেশীরভাগ মেয়েই নতুন। পুলিশের ধরপাকড় শুরু হবার পর তাসের রমরমা আড্ডাটা ভেঙে গেছে। এখন অনিয়মিতভাবে এখানে ওখানে কিছু লোক বসে।

অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে গেলে মঈনুদ্দীন, 'ধূর কি ছিল আর কি হল। আতরভাইরে দরকার ছিল এ সময়। সে সব যোগাড়যন্ত্র কইরে আবার গুছিয়ে আইনতে পাইরত। চল রতন মিয়া ঘরে ফিরে যাই।'

রাতে রতন ফিরতে আলো বলল, 'থানায় গিয়ে ওসিকে বলে এসেছি। খুব একটা গরজ করলেন না। বললেন আমরা নাকি মিছে মিছে ভাবছি। এ গ্রামে আর কোনো ঝামেলা হবে না। না হলেই ভালো। ভালোয় ভালোয় যদি সব মিটে যায়। তবে আমি বলে এসেছি কোনো দরকারে যদি ডাকি তাহলে সাথে সাথে উনাকে আসতে। বলেছেন তো আসবেন।'

'খুব ভালো কাজ কইরেছেন ভাবী। ইবার আর উরা বেশী বাড়াবাড়ি করার সাহস পাইবে না নে।'

দিনতারিখ ঠিক হয়ে গেছে। আর দু'দিন পরে ধানকাটা শুরু হবে। ঘরে ঘরে তার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।

আগের দিন রাতে আলো নামাজে বসে অনেকক্ষণ দোয়া পড়ল, 'হে আল্লাহ আমার তো কোনো কিছুই ঠিকমত হয় না। এবার যেন সব কিছু ঠিক মতো হয়। গ্রামে আবার যেন কোনো গন্ডগোল না হয়।'

বাজার থেকে জয়নাল গতকালের পত্রিকাটা নিয়ে এসেছিল। হ্যারিকেনের আলোয় পাটিতে হেলান দিয়ে আলো পাতা উল্টাছিল পত্রিকার। শেষের পাতায় ছবি আর খবর দেখে আলোর হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল।

খুব পরিচিত একজনের ছবি তার নীচে খবর 'দুর্নীতি আর প্রতারণার অপরাধে সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী মির্জা শামসুল হক গ্রেফতার'।

নীচে বিশদ করে মির্জার কুকীর্তির বিবরণ। তিন স্ত্রী, পাঁচটা বাড়ি, একরের পর একর জমি, কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স সব কিছুর চুলচেরা হিসাব। আলো ভাবে এর চেয়েও অনেক বড় যে অপরাধটা মির্জা করেছে কেউ জানবে না তার কথা, তার জন্য শাস্তি হবে না ওর? আলোর মতো আরো কারো সর্বনাশ কি করেছে মির্জা? শেষ পর্যন্ত মির্জা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না। কি শাস্তি হবে ওর? কয়েক বছরের জেল? ওর মতো লোকের তো ফাঁসি হওয়া উচিত। তবু কিছু তো শাস্তি পাবে লোকটা কৃতকর্মের জন্য। আলোর বুকের ভেতরটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে ওঠে। মনে হয় অনেকদিন পর ও আজকে দুঃস্বপ্ন ছাড়াই ঘুমাতে পারবে।

ভোরবেলা সবার সাথে আলো আর রতন রওয়ানা দিল ধানক্ষেতের দিকে। দূর থেকে দেখল অনেক লোক জড়ো হয়ে আছে ওদের ক্ষেতের কাছে।

রতন বলল, 'বেপারটা সুবিধের লাইগছে না। এই তুরা সব ঠিক আছিস তো?'

সবাই নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। ওদের সাথে সাথে শহীদ আসছিল।

আলো বলল, 'জলদি যা । ওসিকে গিয়ে বল আমি ডেকেছি । এখনি আসতে ।' শহীদ দৌড়ে চলে গেল ।

ক্ষেতের কাছে আসতে ওরা দেখল প্রায় জনা তিরিশেক লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে । তাদের কারো কারো হাতে লাঠি ছাড়াও আছে জ্বলন্ত মশাল । তাদের সামনে নেতা হয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজনকে দেখে চমকে উঠল রতন । মঈনুদ্দীন, হরিপদ আর মহির সাথে দাঁড়িয়ে আছে শফিক মিয়া । ও-ও ছাড়া পেয়ে গেছে? মহি শেষ পর্যন্ত নিজের মুখোশ খুলল তা হলে । আর হরিপদ? ওর পাশের বাড়ির প্রতিবেশী । কি দোষ করেছে ও তার কাছে?

রতনকে দেখে শফিক মিয়া বলল, 'কেমুন আছ রতন মিয়া? পিরীতের নাগর? তুমার জন্যি তো এখুনো মালা পথ চাইয়ে বইসে আছে ।'

'আছি ভালোই । তা তুমি কবে ছাড়া পেলা? ইখানে কি কইরছ এখুন?'

'তুমি কি ভাবছ যে জমি তুমি আমারে আর আতর আলীরে বেচিছ তা জজের এক কথায় আবার ফিরে পাইবা? গেরামের রাজনীতি এত সহজ? আমাদের ভোদাই পাইছ তুমি? শুনো রতন মিয়া আগের ধান ঘরে তুলছ কিছু বুলি নাই আমরা । অবশ্য বুলার জন্যি তখুন আমরা ছিলামও না । তুমার ভাবীজান ঢাকা শহর থেইকে আইসে খুব মাতবরি কইরছে । তারে বুল যেখানের পাখি সেখানে ফিরে যাইতে । আর তুমিও এখুন মানে মানে কেটে পড় । এই জমির ধান আমরা তুইলব । আমরা ভাগাভাগি কইরে নিব ।'

রতন বলে, 'এত সহজ না? সারা গেরামের মানুষ আমার পাশে আছে । তুমি এই তিরিশটা লোক নিয়ে কি কইরবা?'

'গেরামের মানুষ? হাসাইলা আমারে । তাদের তো একটা ফু দিলে দৌড়ে পালাইবে তারা । যত সব মিনমিনে ইন্দুরের দল । ওই পালা তুরা । বেশী মাতবরি করিস নে । পিপিলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে ।'

শফিক মিয়ার কথায় রতনের সাথে আসা প্রায় জনা পঞ্চাশেক গ্রামবাসী যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে । সবাই একজোট হয়ে এগিয়ে আসে । তাদের সবার হাতেই কিছু না কিছু আছে । ধান কাটার হেঁসো, দা, মোটা লাঠি ।

রতন বলে, 'শফিক মিয়া, খুব ভুল কইরছ তুমি । গেরামের মানুষ আর আগের মতো নেই । তারা এখুন বোঝে, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ । তারা ভাবীর কাছে শিখেছে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক । তারা এইটাও শিখেছে অন্যায়রে প্রশ্রয় দিতে নাই । যারা অন্যায় করে তাদের বাধা দিতে হয় । হাত গুটিয়ে বইসে থাকতে হয় না ।'

রতনের কথা শেষ হবার আগেই সংঘবদ্ধ জনতা এগিয়ে আসে লাঠিয়াল বাহিনীর দিকে । এরা প্রকৃত লাঠিয়াল নয় । আশেপাশের গ্রাম থেকে শফিক মিয়া আর মঈনুদ্দীন ধরে এনেছে এদের । এত বড় সশস্ত্র জনতাকে এক হয়ে এগিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে যায় তারা । পিছু হটে যায় । ওদের সাথে পিছু হটে মহি আর হরিপদও । শুধু দাঁড়িয়ে থাকে শফিক মিয়া আর মঈনুদ্দীন । ওদের দু'জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল ।

শফিক মিয়া লাল চোখ করে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'তুমি কি মনে কইরছ রতন মিয়া । এই জমির ধান তুমি ভোগ কইরতে পারবা । যদি আমরা ধান ঘরে তুইলতে না পারি তাহলে তুমিও তুইলতে পারবা না ।'

শফিক মিয়া কথা বলতে গ্রামবাসী ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিয়াল বাহিনীর দিকে । ওদের পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে যায় মহি আর হরিপদ । লাঠি ফেলে লুঙ্গি হাতে তুলে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় মারে সেই বাহিনী । এই উত্তেজনা আর গোলমালের মধ্যে কেউ লক্ষ্য করে না কখন শফিক মিয়া আর মঈনুদ্দীন ছুঁড়ে মেরেছে তাদের হাতের মশাল পাকা ধানের ক্ষেতে । সোনালী ধানের শিষ যখন আগুনের লেলিহান শিখা নিয়ে দাউ

দাউ করে জ্বলে উঠল ঠিক তখন ওসি বিশাল বাহিনী নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে হাজির হল সেখানে। রতন আর গ্রামবাসী না দেখলেও দৌড়ে আসতে আসতে ওসি দেখেছে কে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মেরেছে ধানক্ষেতে। শফিক মিয়া আর মঈনুদ্দীনের পালানোর পথ থাকে না। হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় ওরা। পুলিশের হাতকড়া পরে গ্রামবাসীর পদপিষ্ট মাটিতে শুয়ে থাকা মহি আর হরিপদর হাতেও।

ওসি বলে, 'জেল থেকে বের হয়েই এ কাজ? দাঁড়া, আর যাতে তোরা বের হতে না পারিস সে ব্যবস্থা করছি।'

দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল আগুন ক্ষেতের এক কোণ থেকে। পুরো গ্রামের নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন নেভাতে। পুকুর থেকে ঘড়া বালতি কলস ভরে জল নিয়ে আসতে থাকল। ছুঁড়ে মারতে থাকলো আগুনের লাল শিখার ওপর। ওদের সাথে আলোও হাত লাগাল সমান উদ্যমে। আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা সেই সামান্য জলে কিছুতেই তৃপ্ত হচ্ছিল না। আরো উজ্জ্বল আরো বলীয়ান হয়ে উঠছিল অগ্নির তান্ডব।

আলো বলল, 'মাঝখানের সব ধান কেটে ফেল। তাহলে আর আগুন ছড়িয়ে যেতে পারবে না।'

পিঠে আগুনের আঁচ নিয়ে একদল লোক নেমে গেল আগুয়ান আগুনের পথে ছড়িয়ে থাকা ধানগাছগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে নিতে। ওদের হাতে হেঁসো চলতে লাগলো বিদ্যুৎ গতিতে, মেশিনের চেয়েও দ্রুত। একদিকে সম্মিলিত জনতার জলের বর্ষণ অন্য দিকে আগুন ছড়িয়ে যাবার পথ বন্ধ করে সবশেষে আগুনকে বশে আনতে পারলো গ্রামবাসী। যখন শেষ আগুনের শিখাটা নিভে গেল ততক্ষণে ক্ষেতের প্রায় এক তৃতীয়াংশের ধান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আলো আর রতন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখে। আলোর সমস্ত শরীর ভিজে সপসপ করছে। মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে। আগুনের আঁচে লাল হয়ে গেছে আলোর মুখ। বাতাসে ছাই ভেসে এসে ঘামের সাথে লেপ্টে আছে আলোর গালে, গলায়, কপালে। মিত্তির বাড়ির মা কালীর মতো লাগছে আলোকে।

হেঁসোর আঘাতে ছিঁড়ে গেছে রতনের পরনের গেঞ্জি, হাত কেটে ফালা ফালা হয়ে রক্ত ঝরছে। উড়ন্ত আগুনের তাপে শরীরের বিভিন্ন খানে ফোস্কা পড়েছে। আগুনের তাপে কালো চুল ঝলসে লাল হয়ে গেছে।

রতন বলে, 'চিন্তা করবেন না ভাবী, যেটুকু বেঁচেছে তা দিয়ে আমাদের হইয়ে যাবে। আর এইযে পোড়া ছাই। খুব ভালো সার হবে ই দিয়ে। আগামী বার অনেক ফলন হবে এ জমিতে।'

রতনের কথা শুনে হেসে ফেলে আলো। ভীষণ ভালো লাগে রতনের। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবী হেসেছে। আগুনে পুড়ে যেন প্রায়শ্চিত্ত হল রতনের। যত গ্লানি, যত পাপ, যত অপরাধ সব পুড়িয়ে ফেলে রতনের ভেতর থেকে খাঁটি মানুষটা বের হয়ে এল। এ মানুষটাকে ভাবী ক্ষমা করতে পারবে তো?

পরাগ সোনামণি,

কেমন আছিস তুই? পড়াশুনা নিয়ে খুব ব্যস্ত? আমার কথা মনে পড়ে তোর? চিঠি লিখিস না কেন? মাকে আর দরকার নেই তোর? চিঠি লিখবি। তোর সব কিছু বর্ণনা করে বড় বড় চিঠি লিখবি।

তোর চাচা মুক্তি পেয়েছে জেল থেকে। ধানও উঠে গেছে ঘরে। ভেবেছিলাম এবার আমি ঢাকায় ফিরে আসব। কিন্তু কি জানিস এই গ্রামটা গভীর মায়ার বাঁধনে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। গ্রামের সবাই বলে, 'কি হবে আপনার ঢাকায় ফিরে গিয়ে? ইখানেই থাকেন না আমাদের সাতে মিলেমিশে।'

আমারও এখানে থাকতে খুব ভালো লাগেরে। তুই বলেছিস না শান্তিপুর গ্রামের আমি রাণী। এই রাজত্ব ফেলে ঢাকায় গিয়ে আবার ঘুঁটেকুড়ুনী হতে ইচ্ছে করে না রে। আমি জানি তুই কি বলবি? যে লোকটা আমাদের সমস্ত দুঃসময়ের জন্য দায়ী তার সাথে আমি কি করে এক বাড়িতে থাকব? কি করে ভুলব তোর বাবার শেষ মুহূর্তগুলোকে? কি জানিস তোর চাচার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক অন্য রকম হয়ে গেছে ও। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। চেষ্টা করছে ভালো মানুষ হয়ে উঠবার। আমি ওকে ক্ষমা করতে পেরেছিরে। তুই ওর সাথে কথা বললে তুইও হয়তোবা ওকে ক্ষমা করতে পারবি।

আমি ভাবছি গ্রামের মেয়েদেরকে নিয়ে কিছু একটা করব। কি করা যায় আমাকে বলতো? সমবায় সমিতি? কুটির শিল্প? রতন বলেছে আমাকে সাহায্য করবে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যেও উৎসাহ আছে। যদি কিছু করতে চাই মনে হয় করাটা সম্ভব হবে।

তোর কি খুব কষ্ট হবে একা একা থাকতে? তোর মামী তো তোকে কত আদর করে! তুই পারবিনা ওদের সাথে মিলেমিশে থাকতে? ছুটিতে আমার কাছে আসবি। আমিও না হয় যাবো মাঝে মাঝে তোকে দেখতে। ঢাকায় থাকলে আমার সারাক্ষণ মনে পড়ে তোর বাবার কথা, আমাদের কষ্টময় সময়গুলোর কথা। প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি বাড়ি, মানুষের কোলাহল আমার স্মৃতিকে সবসময় জাগিয়ে রাখে। আমার ভীষণ কষ্ট হয় রে। পাগল পাগল লাগে। গ্রামের নিরব, শান্ত পরিবেশে আমি স্থির থাকতে পারি। মাথাটা ঠান্ডা রাখতে পারি। দিনগুলো আনন্দের মধ্যে কাটাতে পারি। আমার কষ্ট হয় না। মার শান্তির জন্য তুই এটুকু স্বার্থত্যাগ করতে পারবি না?

তুই আবার কবে আসবি বাবা? তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

ভালো থাকিস। আমার অনেক দোয়া নিস।

ইতি মা

কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে বসে পরাগ চিঠিটা পড়ে। ওর চোখ দু'টো জলে ভরে ওঠে। ওর প্রিয় মা কত কষ্টের পাহাড় পাড়ি দিয়েছে এ জীবনে। আজ যদি একটু শান্তি খুঁজে পায় তাহলে পরাগ নিজে যে কত স্বস্তি পাবে মা কি বোঝে? পরাগ লেখে

আমার প্রাণপ্রিয় মা,

আমি খুব ভালো আছি। পড়াশুনার অনেক চাপ। কোনোদিকে তাকানোর সময় পাইনা। মামী আমাকে খুব যত্ন করে। তুমি থাকলে বলতে আদর দিয়ে দিয়ে মামী আমাকে নষ্ট করে ফেলছে। সামনে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল। সেটা শেষ হলে এক এক করে প্রিটেষ্ট, টেষ্ট। তারপর তো চলে আসবে বড় পরীক্ষা। আমি হয়তোবা সময় করে উঠতে পারবো না গ্রামে যাবার। তুমি কি আসতে পারবে সময় করে?

তুমি থাকো মা। ওখানে থেকে যদি তুমি শান্তি পাও তাহলে থাকো। চাচাকে যদি তুমি ক্ষমা করে দিতে পারো তাহলে আমি কেন পারবো না? তোমরা সবাই যদি মিলেমিশে থাকতে পারো তাহলে আমি পারবো না কেন? গ্রামে মেয়েদের জন্য একটা স্কুল কর মা। যদি কোনো মেয়ের পড়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে যে যেন বিনা বেতনে পড়তে পারে। আর গ্রামের মানুষকে বোঝাও মেয়েদেরকে শিক্ষিত করা কত জরুরী। বাবা-মারা যেন জোর করে মেয়েদেরকে ঘরে বন্দী করে না রাখে।

তুমি একবার ঘুরে যাও মা। তোমরা সবাই মিলেই আসো। চাচীরা তো কোনোদিন ঢাকা শহর দেখে নি। ওরা দেখে যাক কেমন এই শহর।

আমার অনেক অনেক সালাম নিও।

ইতি তোমার পরাগ।

চিঠিটা লিখে পরাগ চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। মা সবকিছু ভুলে থাকার জন্য গ্রামে গিয়ে থাকতে চেয়েছে। আর পরাগও ভুলে থাকার জন্যই ঢাকায় থাকতে চায়। গ্রামে যেতে চায় না। আমবাগানে ঢুকলে মনে পড়বে ওর চুলে রাধুর হাত বুলিয়ে দেবার কথা, জাম গাছের নীচে দাঁড়ালে মনে পড়বে পাশে বসে একসাথে জামমাখা খাবার কথা, ঘাটে গেলে মনে পড়বে এক সাথে মেঠোপথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসা, পুকুরপারে গেলে মনে পড়বে ওর হাঁটুতে মাথা দিয়ে রাধুর শুয়ে থাকা, মহির চড় আর লাথি। পরাগ ভুলতে চায় সে সব স্মৃতি। রাধুর কথা মনে হলে ওর বুকের ভেতরটা ছটফট করে ওঠে। খুব কষ্ট হয় ওর। কবিতাকে আশ্রয় করে বের হয়ে আসে বুকের গভীরে প্রথিত অনুভূতি

অলস দুপুর শেষে বসে থাকি ক্লান্ত চোখ মেলে
অপেক্ষার জোনাকীরা মিটমিট আলো জেলে রাখে
কেউ আসে? আসে কেউ?
দেখা কি যায় দূরে মহিষের উড়ন্ত কাফেলা?

অন্ধকারে গান গায় সুগন্ধী নারীর আঁচল
চলে যায় ছবি এঁকে কত শত অচেনা নাবিক
বাতাসে ভাসিয়ে কান নৈঃশব্দ্যে স্থির হয়ে থাকি
যদি বা হারিয়ে যায় অকস্মাৎ মহিষের শ্বাস!

কুয়াশা প্রথম-শীতে গ্রাস করে আদিগন্ত মাঠ
অন্ধ শিশুর মত দিকহীন মহিষেরা ছোটে
পথ ভুলে তারা ছোঁয় দূর কোনো আঙিনার জল
আমার হৃদয়তল অপেক্ষায় নীল হতে থাকে

এখন দরজার কাছে সময়েরা স্থির হয়ে আছে
শীতের অশ্লীল লোভ তুলে আছে নিথর দেয়াল
অবোধ মহিষদল কিছুতেই আসেনা ওম নিতে
আমাকে ক্রন্দিত রাখে বসন্তের আলোর চাওয়ায়॥